চেতনার অন্বেষণে

এপ্রিল সংখ্যা, ২০২২

ডিরোজিও ও বাঙলায় যুক্তিবাদের প্রসার

মন ও মনোবিজ্ঞান

হিন্দুত্ববাদের ধারণা বনাম ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদ

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- মোবাইলে পড়ছেন? তাহলে পত্রিকার মোবাইল ভার্সন ডাউনলোড করুন, মোবাইলে পড়ার সুবিধার জন্যই এই বিশেষ ভার্সনটি করা হয়েছে-
- ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে মাধ্যমে পত্রিকাটি পড়তে ইচ্ছুক নন? তবে এই পত্রিকাটিই প্রিন্ট করে নিতে পারেন, প্রিন্ট করার মত করেই এটিকে সাজানো হয়েছে।
- PC তে পড়লে যে লেখাটি পড়তে চান সূচিপত্রে লেখাটির ওপর ক্লিক করুন।

মোবাইল ভার্সনটি ডাউনলোড করুন – click here

For pc to click: hold ctrl than click mouse left key

‘চেতনার অন্বেষণে’

একটি মুক্তচিন্তক পত্রিকা।

এপ্রিল সংখ্যাটি পড়ুন ও পড়ান

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের মাসিক পত্রিকা **'চেতনার অন্বেষণে'** এপ্রিল সংখ্যা, ২০২২।
পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদনা- **যুক্তিবাদীরা।**

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- nil

ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

সূচি-

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:



সম্পাদকীয়

আজ বিশ্ব বই দিবস, সবাই বই পড়ুন। আমরা মোবাইলের যুগে বই পড়া ভুলছি এ কিন্তু খুবই অন্যায়। নিজের সাথে অন্যায়। মোবাইলে সোশ্যাল সাইটে একটু কম সময় ব্যয় করে মোবাইলেই বই পড়তে পারি। আমাদের ম্যাগাজিনও মোবাইলে পড়ার সুবিধার জন্য আপডেট করাও হয়েছে। আরও বই টেলিগ্রাম গ্রুপে পাবেন। সমস্ত বইগুলিই প্রতিটি মুক্তচিন্তকের অবশ্য পাঠ্য। আর পড়ার পাশাপাশি লিখুনও। পাঠাবেন yuktibadira@gmail.com এই ঠিকানায়। পত্রিকার লক্ষ্যই হল লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, যেমন পারেন লিখুন প্রকাশ করবো আমরা।
ধন্যবাদ। পাশে থাকুন। যুক্তিবাদের জয় হোক।

> **"যে পুস্তক পাঠ করিলে বুদ্ধি, বিবেক, বাস্তবতাবোধ বিলুপ্ত হয় তাহাকে ধর্মগ্রন্থ বলে।"**
>
> -ওয়াশিকুর রহমান বাবু

ডিরোজিও ও বাঙলায় যুক্তিবাদের প্রসার

- রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যুক্তিবাদ বলতে দর্শনের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমেই মনে করেন সতেরো শতকের ইওরোপে প্রত্যক্ষবাদ (এম্পিরিসিজম) বনাম যুক্তিবাদ (র‍্যাশনালিজম)-এর কথা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ থেকেই র‍্যাশনালিজম শব্দটি অন্য এক অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। সেটি হল: মতামত বা কাজকর্মর ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস বা আবেগের ওপর ভরসা না করে যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে আচার-আচরণ ও নীতি ঠিক করা। এর জন্য খুব বড় অভিধান দেখার দরকার নেই; কনসাইজ অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১১ দেখলেই চলবে।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন এই ধরণের যুক্তিবাদী। ভগবান আছেন না নেই এই নিয়ে তিনি কোনো নির্দিষ্ট মত দিতেন না, প্রচার করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবু তাঁকে নাস্তিক বলে দাগা মেরে হিন্দু কলেজের শিক্ষক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ডিরোজিও কিন্তু তাঁর ছাত্রদের একটা কথাই বলতেন: কোনো বিষয়ে মত স্থির করার আগে তার পক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি আছে সেগুলো জেনে বুঝে বিচার করে তবে নিজের মত ঠিক করবে। এই শিক্ষাই ডিরোজিওর স্বল্পায়ু জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। কারুর কথা শুনে বা আবেগের বশে কোনো মতের প্রতি পক্ষপাত দেখানো উচিত নয়; বরং নিজের বোধবুদ্ধির ওপর ভরসা রেখে পক্ষে-বিপক্ষে যা বলার আছে সেগুলো নিক্তিতে ওজন করে ঠিক করো: কার পাল্লা ভারী। ছাত্রদের তাই যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে উৎসাহ দিতেন তিনি। নিজেরা মাথা খাটিয়ে, দরকার মতো পড়াশুনো করে তারা যেন ঠিক-ভুল পরখ করতে শেখে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ডিরোজিওর ছাত্ররা দেখা দিয়েছিলেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ও কৃতী মানুষ হিসেবে। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ — এঁদের নাম বাঙলার ইতিহাসে, বিশেষত শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সদাস্মরণীয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এঁদের কয়েকজনের নাম অক্ষয় হয়ে আছে। বাড়ির মেয়েদের পড়ার জন্য মাসিক পত্রিকা বের করা কম গৌরবের বিষয় নয়। তার সম্পাদক ছিলেন রাধানাথ সিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র। বাঙলা সাহিত্যিক গদ্যর বিকাশে তাঁদের অবদান এখনও বোধহয় ঠিকমতো বোঝা হয়নি। টেকচাঁদি ভাষা দাঁড়িয়ে থাকে বিদ্যাসাগরি আর হুতোমি ভাষার ঠিক মাঝখানে। উঁচু আর নিচু রীতির মধ্যে মাঝারি রীতি। একেও বলা যেতে পারে ডিরোজিওর পরোক্ষ প্রভাব।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭)-র আগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বোঝাত: একজন সায়েব (বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান)-এর কাছে কাজ চালানোর মতো ইংরিজি শেখা। অন্য কিছু স্কুলে (বাঙালি-পরিচালিত) একই ধরণের ইংরিজি শিক্ষা হতো: ছড়া কেটে ইংরিজি শব্দ ও তার বাঙলা প্রতিশব্দ মুখস্থ করানো। তার পরেও, আরও উঁচু ক্লাসে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের কিছু তথ্য মনের মধ্যে গেদে দেওয়া হতো।
ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রাঁস চেয়েছিলেন: আমাদের শিক্ষণ ভরা হোক ভাবনায়। এতকাল এটি শুধু তথ্য দিয়ে ঠাসা হয়েছে' (Let our teaching be full of ideas. Hitherto it has been stuffed only with facts)। অবশ্যই এ এক নতুন শিক্ষাদর্শ। এখনও পর্যন্ত বাস্তবে তার নমুনা চোখে পড়ে না। কোনো কোনো মনীষী এর জন্যে নিজেরাই আলাদা আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বারট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel)-এর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ভেতরে থেকে, প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও ডিরোজিও চেয়েছিলেন কিশোর ছাত্রদের মনে অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় পক্ষপাতহীন যুক্তিবুদ্ধির বীজ রোপণ করতে। তার জন্য তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছিল। কুৎসা রটনা ছাড়াও তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। হিন্দু কলেজের পরিচালকরা রীতিমতো কোমর বেঁধে, প্যাঁচ কষে ডিরোজিওকে তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে সরালেন।

এর থেকে একটা জিনিস বোঝার আছে: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র আর যুক্তিবুদ্ধির সহাবস্থান অসম্ভব। মুক্তচিন্তা আর পাঠক্রম মেনে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও তার ফল – দুটো একযোগে চলে না। ডিরোজিও-ও সে কথা বুঝতেন। তাই হিন্দু কলেজের বাইরে, নিজের বাড়িতে ও মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-র বাগানবাড়ির ঘরে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন গড়ে মুক্ত চিন্তা বিকাশের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। রেভারেন্ড লালবিহারী দে লিখেছেন: ‘The young lions of the Academy roared out, week after week, “Down with Hinduism! Down with orthodoxy!”’

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি সমাজে তথ্যের পাশাপাশি ভাবনাচিন্তার একটা জায়গা হলো। যত সঙ্কীর্ণই হোক তার সীমা, বাঙালি সমাজের ওপরের স্তরে তার থেকেই একটা কাঁপন ধরল। তার উদ্যোক্তা সব ক্ষেত্রেই ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গলরা নন। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন বেশ কিছু মানুষ, তাঁদের সকলেই অবশ্য ইংরিজি শিক্ষিত, ঢাকঢোল না-পিটিয়েই, শাঁখ-ঘণ্টা না বাজিয়েই একটি একটি করে প্রথাবিরোধী কাজ শুরু করলেন। এগুলোর সাথে ডিরোজিও কেন, কোনো ডিরোজিয়ানেরও সাক্ষাৎ যোগ ছিল না। তবু কলকাতা ও মফস্বলে যুক্তিবুদ্ধির প্রসার এইভাবেই হয়েছে। এঁরাও ডিরোজিওর–ই সন্ততি।

রামমোহন রায় যখন সতীদাহ-র বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম পুস্তিকাটি লিখলেন (১৮১৮) সেখানেও বিষয়টি উপস্থিত করা হয়েছিল তর্ক-র আকারে: প্রবর্তক (যিনি সতীদাহ চান) আর নিবর্তক (যিনি তা বন্ধ করতে চান) এমন দুজন কাল্পনিক ব্যক্তির ‘সম্বাদ’ বা ডায়ালগ (ঠিকমতো বললে: ডুওলোগ) হিসাবে। এখানেও সেই দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের দ্বন্দ্ব। রামমোহন নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দেন নি, সে-বরাত পাঠকের ওপরে।

বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনাটিও চিরস্মরণীয়। তক্কাতক্কি তো ভারতের লোকে বহুকাল ধরেই করে আসছেন। কিন্তু সে হলো শখের তক্ক। তার মীমাংসার ওপর জগৎ-জীবনের কিছুই নির্ভর করে না। অমর্ত্য সেন যাদের ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’ (আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান) বলেছেন, তাদের সঙ্গে রামমোহনের সময় থেকে যে সব তক্কাতক্কি শুরু হলো, তার তফাত অনেক। সতীদাহ থাকবে না বন্ধ হবে, বিধবার আবার বিয়ে দেওয়া যাবে, না যাবে না; একজন লোকের অনেক বউ থাকা উচিত না অনুচিত — এই ধরণের বিষয়ে তক্কাতক্কির একটা ব্যাবহারিক গুরুত্ব আছে। এগুলো শুধুই ‘সুখপাঠ্য লাঠালাঠি’ নয়, এগুলোর মীমাংসার ওপরে মেয়েদের — সব জাতের, সব অবস্থার মেয়েদের — বাঁচা-মরা জড়িয়ে আছে।

দুঃখের বিষয়, রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর পরিচয় হয়নি। অনেক বছরই তাঁরা এক শহরে বাস করেছেন। কিন্তু ফিরিঙ্গি সমাজ আর বাঙালি সমাজের মধ্যে তেমন যোগ ছিল না, বরং বিয়োগই ছিল বলা যায়। বোধহয় সেই কারণেই ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামন্ড বা তাঁর কোনো ছাত্রের সঙ্গে রামমোহন রায়ের পরিচয় হয় নি।

সতীদাহ বন্ধ করার আইন, ১৮২৯-এর ১৭ নং রেগুলেশন জারি হলো। রামমোহন অবশ্যই তাতে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সমর্থনে খুব অল্প লোকই ছিলেন, এগিয়ে এসেছিলেন আরও কম লোক। গণভোট নিলে সতীদাহ সমর্থকরাই বিপুল ভোটে জয়ী হতেন। (বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে সত্যি; প্রগতিশীলরাই এখানে সংখ্যালঘু, রক্ষণশীলরাই সংখ্যাগুরু)। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি জায়গা থেকে সতীদাহ বন্ধ করার সমর্থন এসেছিল। ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল (ডিসেম্বর ১৮২৯)-এ একটি কবিতা বেরোল; ‘অন দ্য অ্যাবলিশন অব সতী’। কবির নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন; ‘বিষয়টি কবিরই যোগ্য; আর কবি দেখিয়েছেন যে তিনিও এই বিষয়ে (কবিতা রচনায়) অনুপযুক্ত নন।’

সমাজ সংস্কারের মতো চিন্তাসংস্কারও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাঙলায় পরবর্তীকালে যাঁরা সেই কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের সবাই ডিরোজিওর কাছে — আর তার সঙ্গে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কাছেও — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী। ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্ররা তাঁর যুক্তিবাদের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান নি। দিলীপকুমার বিশ্বাস দেখিয়েছেন একজন ডিরোজিয়ানও ‘উত্তর জীবনে নাস্তিকতা প্রচার করেন নি।’ কথাটি ঠিক। ডিরোজিয়ান তথা ইয়ং বেঙ্গল-এর মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ

খ্রিস্টান হয়েছিলেন, হরচন্দ্র ঘোষ নিষ্ঠাবান হিন্দু-ই থেকে যান, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্ম হন, প্যারীচাঁদ মিত্র ব্রহ্মবিদ্যা বা থিওজফি আন্দোলনে যোগ দেন, আর রসিককৃষ্ণ মল্লিক এক সর্বজনীন ধর্ম-য় বিশ্বাস করতেন।

বরং নাস্তিকতার ধারাটি প্রচার হয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্ত মারফত। ধ্রুববাদী (পজিটিভিস্ট) আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। বিশেষ করে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যর নাম করা যায়। এঁরা কেউই সরাসরি ডিরোজিও-প্রভাবিত ছিলেন না। তবু বাঙলায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের হাতেখড়ি হয়েছিল ডিরোজিওর কাছে — এই সত্যটি অস্বীকার করা যাবে না। বাঙলা সাহিত্যে ধ্রুববাদী আন্দোলনের দিকচিহ্ন ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ-য়। জ্যাঠামশায় এক আশ্চর্য চরিত্র। ইতিহাসের ধারায় দেখলে তিনিও কিন্তু ডিরোজিও-রই উত্তরসূরি।

আর একটি কথা বলে আলোচনা শেষ করি। ডিরোজিওকে লোকে চেনেন অ-সাধারণ শিক্ষক আর কবি বলে। এখানে তুলনায় কম পরিচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হলো:

ক্রীতদাসের মুক্তি

গোলামির পালা শেষ। কি এক বিচিত্র অনুভূতি!
মুক্তি পেয়ে সমুদ্বেল বুক ভরে গর্বের স্পন্দনে
সহসা ভাস্বর হল অন্তরের মহৎ প্রস্তুতি
নতজানু-দাসত্বের ক্রান্তির ঘোষণা সেই ক্ষণে:
নিজেকে চিনেছে দাস মানুষের আত্মার সম্মানে,
আকাশে তাকিয়ে নেয় নন্দনের বাতাসে জীবন,
বুনোপাখিদের ঝাঁক উড়ে যায়, দেখে ঊর্ধ্বপানে,
মৃদু হাসি মুখে মেখে নিজেকেই জানায় বন্দন!
ওদিকেতে চেয়ে দেখে কলস্বরে ঝর্ণা চলে নেচে,
বাতাস — পাখিরা — ঝর্ণা দেখে ভাবে কি খানিক
"আমিও ওদের মতো মুক্ত হয়ে রয়েছি ত বেঁচে!"
সহসা চেঁচিয়ে ওঠে অতঃপর ভুলে দিগ্বিদিক।
মুক্তি! নাম থেকে ঝরে সুনিবিড় মাধুর্য তোমার,
হৃদয়ের বেদীতটে জ্বেলেছ যে শিখা অনির্বাণ,
স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে উদ্ভাসিত খোলা তলোয়ার
শোণিতের পুণ্য-অর্ঘ্যে এনেছ কি মুক্তির সম্মান!
ধন্য হোক সেই হাত যে-হাত করেছে খান খান
শোষণের শিকলকে; ধন্য হোক সে-আত্মপ্রসাদ
নিপীড়িত মানবাত্মা যার বলে হল বলীয়ান
ক্রীতদাস পেল যাতে অবশেষে মুক্তির আস্বাদ।

ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭
অনুবাদ : পল্লব সেনগুপ্ত
(ডিরোজিও: সময়ের এ্যালবাম, শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায় ও অধীর কুমার সংকলিত, ডিরোজিও স্মরণ সমিতি, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ২০০৩)

ডিরোজিওর অন্য একটি পরিচয় আড়ালেই থেকে যায়। তিনি যে সাংবাদিকও ছিলেন, অনেককটি পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগ ছিল — এই কথাটি খেয়াল করা হয় না। অথচ বাঙলা তথা ভারতে সাংবাদিকতার ইতিহাসে ডিরোজিও-র নাম রেডিয়ামের অক্ষরে লিখে রাখার কথা। কটি কাগজের তিনি সহ-সম্পাদক বা সম্পাদক ছিলেন সে নিয়ে বিতর্ক আছে। এমনকি দ ক্যালাইডোস্কোপ, যে মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'আমার ছাত্রদের প্রতি' (টু মাই পিউপিলস) কবিতাটি বেরিয়েছিল, তাতেও স্বাক্ষর ছিল: এইচ সি।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য সনেট

ফুলের তরুণ কলি যেভাবে ছড়ায় পাপড়ি তার
সেইমতো দেখি মৃদু খুলে যায় তোমাদের মন,
আর কী মধুর খোলে সেই সব সম্মোহন ভার
বেঁধে রেখেছিল যারা তোমাদের সমর্থ মনন,
যে মনন করে দেয় তার সব ডানা প্রসারণ
(গ্রীষ্মের প্রহরে যেমন পাখির শাবক) উড়বার
শক্তির পরখ করে। অভিঘাত কত না হাওয়ার,
প্রথম জ্ঞানের কত বৈশাখের নবীন বর্ষণ।
অগণ্য নতুন কত বোধ — সবই চিহ্ন রেখে যায়
তোমরা নিরত থাকো সর্বশক্তি সত্যের পূজায়।
কত যে আনন্দধারা আমার উপরে পড়ে ঝুরে
যখন তাকিয়ে দেখি যশোদেবী ভবিষ্যমুকুরে
গেঁথে চলেছেন মালা কখনও যা পাবে তোমরা, তাই
সে-সময়ে মনে হয় এ জীবনে বাঁচিনি বৃথাই।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ
(ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেট-কবিতা, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২)

কোনো কোনো শিক্ষককে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পদ্যর কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু ছাত্রদের উদ্দেশে শিক্ষকের লেখা কবিতা — তায় আবার এমন চমৎকার কবিতা — বিরল। কবিতাটি যে ডিরোজিওর — তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। হারিয়ে যাওয়া পত্রিকাটি আগাগোড়া ছেপে বার করেন প্রয়াত অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার যে নীতি-বিষয়ক বিবৃতি, তার সঙ্গে ডিরোজিও-র নিজের মতামতের কোনো মিল নেই। সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাই সঙ্গত কারণেই আপত্তি তুলেছেন ডিরোজিও আদৌ ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিনা।

কিন্তু ডিরোজিও যে দ ইস্ট ইন্ডিয়ান নামক পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই পত্রিকায় অনেক বকধার্মিকের মুখোশ খুলে দেওয়া হতো। যেমন, অগাস্ট ১৮৩১-এ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে পণ্ডিত বিদায়-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। দুশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাঁদের ছেলেদের দু'টাকা থেকে ষোল টাকা হারে দক্ষিণা দেওয়া হয় (১৮৫ বছর আগে টাকার অঙ্কটা তুচ্ছ নয়)। দ ইস্ট ইন্ডিয়ান-এ লেখা হয়েছিল: 'ব্রাহ্মসভা কি ব্রাহ্মণদের ভেলকিবাজির মঞ্চ? আমরা তো জানতাম, তা নয়। কারণ এই সভার প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামমোহন রায়। তিনি মানবপ্রেমের পূজারী, ঈশ্বরোপাসনাকে শুদ্ধতম নীতির উপর স্থাপন করেছিলেন।' তারপর পণ্ডিত বিদায়-এর খবরটি দিয়ে ঐ পত্রিকায় লেখা হয়: 'শুনতে পেলাম সমাজের পরিচালকেরা এমন কাজ নাকি হামেশাই করে থাকেন। দয়াধর্ম প্রশংসনীয় কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা: একই সময়ে কাউকে উঁচুতে তোলা আর নিচুতে নামানোর কী অর্থ আছে? আসলে এ হল সম্পূর্ণ আজগুবি কাণ্ড!'

ঐ পত্রিকাতেই হিন্দুসমাজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: রক্ষণশীল, আধা উদারপন্থী আর উদারপন্থী।

শুধু সাংবাদিকতা নয়, কথায় ও কাজের মিল না থাকলে তার সমালোচনা করাও ছিল দ ইস্ট ইন্ডিয়ান-এর অন্যতম কাজ। তার সম্পাদক সমীপেষু অংশে এমন চিঠি ছাপা হতো। বড়লোকের বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় বড়লাট, ছোটোলাট থেকে প্রধান বিশপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের উপস্থিতি নিয়ে এমন একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। সাংবাদিকতার এই ঐতিহ্য, ডিরোজিওকে বিশিষ্ট ও স্মরণীয় করে রেখেছে।

মন ও মনোবিজ্ঞান

[লিবিডো তত্ত্বের ইতিকথা]

(ফ্রয়েডিয় অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট তত্ত্ব)

-সুদীপ নাথ

অনেকেই বলেন, আমাদের মন নাকি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উনবিংশ শতাব্দি অব্দি অনেকেই মনে করতেন, মন বলতে যা কিছু বোঝায়, তার সব কিছুই জন্মসূত্রে পাওয়া বিষয়। তখন তারা ধারণা করতেন, মনের কোন বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তখনকার ধারণাগুলো সবই ছিল অনুমান নির্ভর। যুগে যুগে বহু মনিষী, মনের অস্তিত্ব ও তার কার্যকলাপ নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে, মানব মনের হদিশ করতে তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। মানব শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সাথে মানব মনের সম্পর্ক খুঁজে পেতে হয়রান হয়েছেন। বিশেষত প্রাণীর ঘিলু তথা মস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়াকলাপ, তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত না থাকার ফলে, শরীর ও মস্তিষ্ক ভিত্তিক মনোবিদ্যা তখনো গড়ে উঠতে পারেনি। তখনও মনোবিদ্যা আলাদা কোন বিষয় হিসেবে গণ্য হত না। দর্শন শাস্ত্রেরই একটা উপশাখা হিসেবে গণ্য হত। সেই কারণে মনোবিদ্যার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিলনা। দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকার কারণে, মানুষের মন নিয়ে সকলেই, যার যার নিজের মত করে, যা খুশি বলার রাস্তা খোলা ছিলো।

তখন পর্যন্ত সকলেই, নিজের মন দিয়েই অন্যের মন বোঝার চেষ্টা করতেন । তখন দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বোঝা ও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা। কবি সাহিত্যিকেরা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই মনের দ্বন্দ্ব খুঁজে বেড়াতেন। তখন জার্মান দেশই ছিল মনোবিদ্যা চর্চার প্রাণকেন্দ্র।

এদিকে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frayed), The Interpretation of Dreams এবং Psychopathology of Everyday Life নামে দুটি বই লিখে পরিচিত হন। এই বই দুটি থেকে জানা যায় যে তিনি মানসিক রোগগ্রস্ত মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্বাভাবিক মনের ঠিকানা খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। ১৯০৫ সালে ফ্রয়েড যৌনমানস সম্পর্কে এক বইয়ে যৌনতার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কিত এক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূল কথাটি ছিল সর্বরতিবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে শৈশবের সবকিছু ইচ্ছা এবং আচরণই যৌনতা ভিত্তিক। ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব লিবিডো তত্ত্ব নামে পরিচিত। তিনি আরও একটা তত্ত্ব খাড়া করে তার নাম দিয়েছিলেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। এই তত্ত্ব অনুসারে মাতার প্রতি পুত্রের মনে কামেচ্ছা জাগে এবং এই কামেচ্ছা নিবারনে পিতাকে সে তার পথের কাঁটা হিসেবে গন্য করে। একই ভাবে, কন্যারাও মাতাকে তাদের পথের অন্তরায় ভাবে। ফ্রয়েড ধারণা করেন এই সমস্ত তত্ত্ব দিয়েই সমাজ ও মানুষের জীবনের সমস্তকিছুই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তখন দার্শনিকদের বেশিরভাগই আমাদের মননক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে ভাববাদের আশ্রয় নিতেন, কল্পনার আশ্রয় নিতেন। ফ্রয়েড কিন্তু সেদিক থেকে একধাপ এগিয়ে নৃবিদ্যা, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছেন। ফ্রয়েড প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাহায্য নেন নি। অথচ তখনই প্রকৃতি বিজ্ঞান অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেলেছে। ফ্রয়েড মনে করতেন মানুষ সহজাত হিংস্র প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায় এবং তা সভ্যতার চাপে অবদমিত হয়ে থাকে। সময় সুযোগ মত তা মানুষকে হিংসাশ্রয়ী ধ্বংসাত্মক কাজ করতে উৎসাহিত করে।

তিনি আনস্টাইনকে এক চিঠিতে, এই তত্ত্ব জানিয়ে এক বিশাল চিঠি লিখেছিলেন । তিনি ঐ চিঠিতে আনস্টাইনকে লিখেছিলেন, এই তত্ত্ব অনুসারে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, যুদ্ধ হবেই। এই তত্ত্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের খুব মনপছন্দ হয়ে উঠেছিল। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর ব্যক্তি চেতনার প্রসারে, সাম্রাজ্যবাদ যখন বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনায় কোণঠাসা, ঠিক তখনই ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে তারা লুফে নিয়েছিল। যুদ্ধ উদ্দেশ্য মাত্রই বাজার দখল – এই ধারণা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করে, সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তার জয়গান শুরু করে দিল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তত্ত্বকে চাপিয়ে দেয়া হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতে এই তত্ত্ব বাধ্যতামূলক করে টেক্সট্ বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করে নিল।

এখনো ভারতের সমস্ত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, এই তত্ত্ব বয়ে নিয়ে চলছে। কোনও বুদ্ধিজীবী টু শব্দটিও করছেন না, যা ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ ঐ সময়ের আগেই এই আজগুবি তত্ত্ব বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে বিজ্ঞানী মহল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই তত্ত্বের উপর আর নির্ভর করে না।

ক্ষুদ্র পরিসরে এখানে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের অসারত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোটকথা, ফ্রয়েড যৌনতাকে আশ্রয় করে তত্ত্ব বানিয়েছিলেন, অথচ যৌনতার উৎস খুঁজতে সামান্যতম চেষ্টাও করেননি। যৌনতার এনাটমি ও ফিজিওলজি নিয়ে চিন্তাও করেননি। যৌনতাকে মনন ক্রিয়ার পশ্চাৎপট (back ground) বিষয় হিসেবেই ধরে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। মানসিক ক্রিয়ার অধঃস্তর (material substratum) অর্থাৎ মস্তিষ্ককেই বাদ দিয়ে, মনকে বুঝতে চেষ্টা করে গেছেন ফ্রয়েড সাহেব। ফ্রয়েডের কয়েকজন উত্তরসূরি, এই তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও, বিশেষ কোন নূতন দিক নির্দেশ করতে পারেননি।

এদিকে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই জারের সহায়তায়, রাশিয়ার একদল বিজ্ঞানী, গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, কালজয়ী শর্তাধীন পরাবর্ত তত্ত্ব (Theory of Conditioned Reflex) আবিষ্কার করেন। এই বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে ছিলেন নোবেন জয়ী ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ। ল্যাবরেটরিতে, হাতে কলমে পরিস্কার পর পরীক্ষা চালিয়ে যান। শর্তাধীন পরাবর্ত ভিত্তিক মনোবিদ্যার শুরু তখন থেকেই। তারপর পাভলভের নেতৃত্বে একের পর এক, অজানা তথ্য আবিষ্কার হতে থাকে।

সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, চিন্তা, স্বপ্ন, প্রক্ষোভ(emotion), ঐচ্ছিক নির্বাচন ইত্যাদি মনন ক্রিয়ার, বস্তুনির্ভর অধঃস্তরের (material substratum) সন্ধান এইসব গবেষণা থেকেই পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ ও জৈব রসায়নের, যেমন হরমোন ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান আবিষ্কার, পাভলভের এই তত্ত্বকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। অনুমান নির্ভর অন্তর্দর্শন ভিত্তিক মনস্তত্ত্বের দিন, তখনই ফুরিয়ে যায়।

পাভলভই মনোবিদ্যাকে দর্শনের গণ্ডির বাইরে বের করে এনে, বিজ্ঞান নির্ভর মনোবিদ্যা চর্চার সোপানটি স্থাপন করেন। পাভলভের এই তত্ত্ব নির্ভর করে, প্রমাণিত হয়েছে মানুষের সবকিছু ধ্যানধারণার উদ্ভব ঘটে, মস্তিষ্কে বাইরের জগতের ঘটনা এবং বস্তুর ধর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন থেকে। আর চেতনা হচ্ছে অতীব জটিল বস্তু-মস্তিস্কের বিশেষ প্রক্রিয়া। বাস্তব বহির্জগতের প্রতিফলনই, বাস্তব মস্তিষ্কে চেতনার প্রতিফলন ঘটায়।

বহির্বাস্তবের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে [পাঁচটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে, শ্রবণেন্দ্রিয় (কান), দর্শনেন্দ্রিয় (চোখ), ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাক), স্বাদেন্দ্রিয় (জিভ) আর স্পর্শেন্দ্রিয় (চামড়া)], সম্পর্ক রক্ষার কাজই হচ্ছে স্বজ্ঞান প্রক্রিয়া বা চেতনা । চেতনা সংবেদনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে বহির্বাস্তবের প্রতিফলন। আর এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী 'প্রতিফলন তত্ত্ব' যা The Theory of Reflection নামে সমাদৃত।

এই প্রতিফলন তত্ত্বের (Theory of Reflection) উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানীরা কয়েকটি মৌলিক সূত্রও উপস্থাপিত করেন। মানুষ যখন প্রথম সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়, তখন মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে, মানব মনে আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। সামাজিক ক্রিয়া-কান্ডের সাথে মানুষের মনেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। এখানেই ফ্রয়েডের মনগড়া তত্ত্ব দূরে হঠে গেছে। ফ্রয়েড ভেবেও দেখেননি যে, পরিবার প্রথার বিবর্তনের ধাপগুলো কিভাবে ঘটেছে। এ পর্যন্ত কয়েক ধরণের পরিবারের রূপ আমরা দেখেছি। আর তিনি বর্তমানের অতি প্রকট, এক-পতিপত্নী পারিবারিক রূপটির বাইরে কিছুই জানতেন না, বা দেখতে চেষ্টাও করেন নি। আর বর্তমানের এই এক পতিপত্নী পারিবারিক রূপটিও যে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গতে শুরু করেছে, এটা সকলে দেখতেই পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে পিতার খোঁজ থাকবে কিনা কে বলতে পারে। আর যে পুত্রের পিতা, বর্তমান সমাজে বাইরে থাকে, পুত্রের জন্মের সময় থেকে, সেই পুত্র যখন কেবল মাত্র মা অথবা, মা ও প্রতিপালিকার সংস্পর্শে বড় হয়, কিংবা শুধুমাত্র প্রতিপালিকার সংস্পর্শে বা হোস্টেলে বড় হয়, তাদের ক্ষেত্রে

লিবিডো তত্ত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? আর যে শিশুর মা জন্মক্ষণে মারা যান বা পিতা সন্তানকে গর্ভে রেখে মারা যান, সেই শিশুদের কি হবে? অথবা এইসব শিশুরা, যখন তাদের দাদু দিদিমারা প্রতিপালকের স্থানে থাকেন, তাদেরই বা লিবিডো তত্ত্বের কি ঘটবে? সমাজের পরিবর্তন ফ্রয়েড সাহেব দেখেন নি। তিনি মনে করতেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আগেও ছিল, এবং তা সনাতন।

বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষণ থেকে মানুষ ভাবনাচিন্তার বিষয় (content) যোগাড় করে। এসব প্রকৃতি আর সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আর আমাদের ক্ষেত্রে, সমস্ত প্রত্যক্ষণের সহায়তায় নূতন নূতন সংকেতের উপর একটা বিমূর্ত রূপ অনুভূত হতে থাকে। এইভাবেই গড়ে উঠে ধারণা। আর তাকে সাধারণীকরণ করার মাধ্যমে তা হয়ে উঠে বিমূর্ত। মস্তিস্ক, বাইরের পরিবর্তনের সাথে সক্রিয় এবং পরিবর্তনশীল সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রতিনিয়ত আমাদের অভিযোজনে সাহায্য করছে। তারই নাম স্বজ্ঞান ক্রিয়া।

অতীতের কোন প্রত্যক্ষণ যখন আমাদের মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগায়, তখন তাকে বলা হয় চিন্তা। তা যুক্ত হতে পারে চলমান প্রত্যক্ষণের সাথেও। অতীতের অনেকগুলো ধারণা থেকেও আমরা নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে পারি। এই পুরনো ধারণার উপর নির্ভর করে, নূতন ধারণা সৃষ্টি করাকে বলা হয় কল্পনা।

মনের মধ্যে একবার ধারণা তৈরি হয়ে গেলে, খুশিমতো একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিয়ে কিম্ভূত কিমাকার অনেক ধারণা তৈরি করাও সম্ভব। জীন, পরী, দৈত্য, এমনকি ঈশ্বরও আমাদের মনে এভাবেই সৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ কল্পনার উপর দাঁড়িয়েই। উচ্চমার্গের মননক্রিয়া তথা ধারণা এবং চিন্তা (concept and thought) যেমন ভ্রান্তি দূর করতে পারে, ঠিক তেমনই আবার ভ্রান্তি তৈরিও করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের মূলে আছে বস্তু।

প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তা এবং চেতনা আমাদের কার্যকলাপ এবং বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থেকেই জন্মায়। আবার অতীতের ধারণা, চিন্তা এবং চেতনা আমাদের কার্যকলাপ এবং জীবনক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে এবং সর্বোপরি জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে।

মনস্তত্ত্ব শুধুমাত্র জীববিদ্যার বিষয় নয়। তা সামজিক-ঐতিহাসিক বিদ্যার সাথেও সম্পর্কিত। মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে স্বতন্ত্র। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুধুমাত্র আমাদের মানসিকতারই বিবর্তন ঘটে না, মনন ক্রিয়ার নিয়মেরও পরিবর্তন ঘটে চলে এবং তা সর্বদা একটা চলমান প্রক্রিয়া।

শর্তাধীন পরাবর্ত তথা Conditioned Reflex-এর দৌলতেই আমরা আমাদের চৈতন্যের উন্মেষ ঘটাতে পেরেছি। এই শর্তাধীন পরাবর্ত আবার শর্তহীন পরাবর্ত অর্থাৎ জন্মগত রিফ্লেক্সের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। নূতন নূতন শর্তাধীন পরাবর্ত যেমন গড়ে উঠে, আবার সেগুলো ভেঙ্গেও যেতে পারে। এই ভাঙ্গা গড়া সবসময় চলতে থাকে।

তাই বলে, মানুষের আচরণের মূলে, নির্জ্জান বা ছোট বেলার অবদমিত কামনা বাসনার কোনও ভূমিকাই নেই। চেতনা অপরিস্ফুট থাকতে পারে, তার ব্যাপ্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে সবকিছু জ্ঞান আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রত্যক্ষনের সাহচর্যে, প্রয়োজনীয় চৈতন্যের সম্যক উন্মেষ ঘটানো সম্ভব।

বাবা রামদেব: আসলে এক ধান্দাবাজ গণশত্রু

-প্রিয়াম সেনগুপ্ত

'আমাকে কারও বাবা গ্রেফতার করতে পারবে না'।

উপরের উক্তিটি আইন-আদালত রয়েছে, এমন একটি দেশের নাগরিকের। দেশটির নাম ভারতবর্ষ। নাগরিকটির নাম বাবা রামদেব। সত্যিই কি কোনও নাগরিক, যিনি দিনের পর দিন নানা অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেও, নুইসেন্স ছড়িয়েও গ্রেফতারি এড়াতে পারেন? আইন বলছে পারে না। বাস্তব কিন্তু বলছে অন্য কথা। বাবা রামদেব এটা করেছেন এবং কোনও দিন গ্রেফতারও হননি। কারণ রাজনীতিকদের সঙ্গে রামদেবের যোগাযোগ গভীর। কীভাবে? সেই উদাহরণ একটু পরে দিচ্ছি। তার আগে, কেন এই লোকটাকে নিয়ে একটু মাথা ঘামানো দরকার হয়ে পড়ল, সেটা বলি।

করোনার সেকেন্ড ওয়েভেও জান কবুল করে লড়ছেন আমাদের দেশের চিকিৎসকরা। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের নাগাড়ে 'মক' করে চলেছেন এই ভণ্ড বাবাজিটি। কয়েকদিন আগে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে 'স্টুপিড সায়েন্স' বলা এই বাবাজিটির দাবি, তাঁর কোনও প্রথাগত ডিগ্রি নেই। কিন্তু চিকিৎসক হতে গেলে নাকি তাঁর মতো চিকিৎসকই হওয়া উচিৎ। কোভিডের বিরুদ্ধে 'ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়র' হিসেবে লড়তে গিয়ে আমাদের দেশে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় শ'চারেক চিকিৎসক। তাঁদের মৃত্যুকে বিদ্রুপ করে রামদেব বলেছেন, যাঁরা অ্যালোপ্যাথির চর্চা করেও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারেন না, তাঁরা অন্যের প্রাণ কী বাঁচাবেন?

এই কঠিন সময়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাণপাত করে লড়ছেন। সেই সময়ে বাবা রামদেবের এই মন্তব্যে চিকিৎসক সমাজের রুষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। খুব প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা রামদেবের গ্রেফতারির দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু তার উত্তরে রামদেব বলেছেন, 'আমাকে কারও বাবা গ্রেফতার করতে পারবে না'।

এই প্রথম নয়, এর আগেও এই লোকটা নাগাড়ে আজেবাজে কথা বলে গেছে। তবু রাজনৈতিক নেতানেত্রী দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে পার পেয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার উদাহরণ পরে দেবো। আগে লোকটার আজেবাজে কথার কয়েকটার নমুনা দিই।

১) কোভিডের দ্বিতীয় ওয়েভে যখন অক্সিজেনের সংকটে একের পর এক মানুষ মারা যাচ্ছেন, তখন বাবা রামদেবের উক্তি, ' অক্সিজেনের তো কোনও কমতি নেই। ভগবান তো সারা ব্রহ্মাণ্ডে অক্সিজেন ভরে দিয়েছেন।'

২) অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের রাক্ষস বলেছিলেন রামদেব।

এবং

কেন অ্যালোপ্যাথির ওপরে বাবা রামদেবের এই তাচ্ছিল্য? কারণ, উনি স্পষ্টতই অ্যালোপ্যাথিক ওষুধকে নিজের ব্যবসার কম্পিটিটর মনে করেন। জানিয়ে রাখা যাক, পতঞ্জলিকে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ দেয় ঘি। দু'নম্বরে আছে আয়ুর্বেদিক ওষুধ। যে প্রোডাক্টের জন্য আপনার কোম্পানি বিখ্যাত হল, সেটা যদি রেভিনিউ জেনারেট করার লিস্টে দু'নম্বরে থাকে— তাহলে কারই বা ভাল লাগবে বলুন?

৩) ঠিক সেই কারণেই বাবা রামদেবের আর একটা দাবি হল, করোনায় অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার জন্যই নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন।

৪) স্কুপহুপের প্রতিবেদন অনুসারে, বাবা রামদেব বলেছিলেন, 'বাচ্চে পয়দে করনা বহোত বাহাদুরি কা কাম হ্যায়'। শুধু তাই নয়, তিনি দাবি করেছিলেন, এমন ওষুধ তিনি বানিয়েছেন, যা শুধু পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে। ড্রাগ্‌স অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ অ্যাক্ট (১৯৫৪)-এ রামদেবের বিরুদ্ধে কোনও মামলা হয়েছে কিংবা তাঁকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

৫) আমিষ খাওয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মলও পায়ু থেকে বেরয়, ডিমও মুরগির পায়ু থেকে বেরয়। তাই ডিম হল মুরগির মল।

৬) লোকটা সাধু-ফাধু নয়। নিখাদ ব্যবসায়ী। জরিবুটির থেকে জিন্‌স— সব বিক্রি করেছে মার্কেটের হাওয়া বুঝে। কয়েকদিন আগে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মহিলারা কেন ফাটা জিন্‌স পরবেন বলে আপত্তি তুলেছিলেন। বাবা রামদেব তারও আগে বাজারে নিয়ে এসেছিলে 'সংস্কারী জিন্‌স'।

এবং

শুধু তাই নয়, প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস দেওয়ার ব্যবসাও রামদেব করেন।

৭) মেহুল চোকসির মতো বাবা রামদেবও ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা ফেরত দেননি এখনও। আরটিআই কর্মী সাকেত গোখলের করা একটি আরটিআই-তে একথা জানিয়েছিল খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক! অথচ আজও লোকটা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৮) আজ তককে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে বাবা রামদেব দাবি করেছিলেন, যে ব্যক্তি ১ মিনিট নিজের শ্বাস আটকে রাখতে পারে, ধরে নিতে হবে, তার শরীরে করোনা ভাইরাস নেই। শুধু তাই নয়, নাকে সর্ষের তেল ঢাললে নাকি করোনা আক্রমণ করতে পারে না। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?

৯) কেউ যোগব্যায়াম করলে তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী হওয়ার ইচ্ছা জাগবে না। সিরিয়াসলি?

১০) রামদেবের অন্তত ২৫টি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞাপনী বিধি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। তারপরেও রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন রামদেব।

১১) বাবা রামদেবের বিরুদ্ধে এর আগেও এফআইআর হয়েছিল। কেন? বেঙ্গালুরু মিরর জানাচ্ছে, 'Ramdev, who had said that he would have beheaded lakhs of people for not chanting 'Bharat Mata ki Jai'।

১২) সমকামিতাকে বাবা রামদেব একটা রোগ বলে মনে করেন। এবং এটাও দাবি করেন, তাঁর কাছে যোগভ্যাস করলে সমকামিতা 'সেরে' যায়।

১৩) বাবা রামদেব মনে করেন, তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বলেই তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি।

এত ভাট, অনৈতিক কাজ, অবৈজ্ঞানিক দাবিক পরেও আজ অবধি রামদেবের একটি চুলও কেউ ছিঁড়তে পেরেছে বলে জানা নেই। এতকিছুর পরেও রামদেব সগর্বে হুংকার দিতে পারেন, 'কারও বাবা আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।' কেন? উত্তরটা খুব সহজ। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গা মাখামাখি। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সঙ্গে রামদের সখ্য কতটা? এক এক করে দেখা যাক।

১৪) বেঙ্গালুরু পুলিস রামদেবের বিতর্কিত মন্তব্যের পর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন খোদ অমিত শাহ। বলেছিলেন, নিজের মনের কথা বলার অধিকার বাবা রামদেবের আছে। এবার বুঝতে পারছেন, কেন রামদেব হুংকার দিতে পারেন, কারও বাবা আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।

১৫) রামদেবও অকৃতজ্ঞ নন। তিনিও অমিত শাহের সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন

১৬) অমিত শাহ মাখন পাবেন আর নরেন্দ্র মোদি বঞ্চিত হবেন, তা তো আর হয় না। সেই কারণেই নরেন্দ্র মোদি 'রাষ্ট্রঋষি' উপাধি দেয় রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হাতে রাখতে পারলে কার বুকের পাটা আছে রামদেবকে গ্রেফতার করবে?

১৭) দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিতিন গড়কড়ি এবং হর্ষবর্ধন (যিনি কি না খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী) উপস্থিতিতে রামদেব দাবি করেছিলেন, তাঁর বানানো ওষুধ 'করোনিল' নাকি ডব্লিউএইচও-র ছাড়পত্র পেয়েছে। সত্যিটা হল, 'করোনিল' কোনও দিন এই ছাড়পত্র পায়নি।

এবং

দাবি করেছিলেন, করোনা সারাতে ১০০ শতাংশ কার্যকরী তাঁর 'করোনিল'।

১৮) পরে অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে রামদেব দাবি করেছিলেন, তিনি নাকি কোনওদিন করোনিলকে করোনা সারাতে পারে বলে দাবিই করেননি।

১৯) তারপরেও সম্প্রতি হরিয়ানা সরকার সে রাজ্যের করোনা রোগীদের 'করোনিল' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই 'ওষুধ' রোগীদের দেওয়া হবে নিখরচায়। দাম দেবে হরিয়ানা সরকার। দামের টাকা আসবে রাজ্যবাসীর ট্যাক্সের টাকায়। অর্থাৎ, যে ওষুধকে প্রস্তুতকারকরাই রোগের ওষুধ বলে স্বীকার করছেন না, সেটা সরকার দিয়ে দিচ্ছে। পকেট ভরবে রামদেবের। কাটমানির লোভ ছাড়া এই প্রস্তাব পাস হয়? আঁতাতটা বুঝতে পারছেন?

এবং

এই হরিয়ানা সরকারই রামদেবকে 'ক্যাবিনেট স্টেটাস' দিতে চেয়েছিল।

২০) শুধু হরিয়ানা নয়। আঁতাত রয়েছে মধ্যপ্রদেশেও। ২০১৭ সালে মধ্যপ্রদেশে যখন কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, মন্দসৌরে পাঁচ কৃষক মারা যান পুলিসের গুলিতে। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সহসভাপতি

রাধামোহন সিং ব্যস্ত ছিলেন বাবা রামদেবের সঙ্গে মঞ্চে যোগব্যায়াম সভা আয়োজন করতে। সাংবাদিকরা কৃষকের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করায় সেটা নিয়ে প্রশ্ন করায় রাধামোহনের জবাব ছিল, ‘যোগব্যায়াম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

২১) মহারাষ্ট্রে বাজারের দরের হাফ দরে ৪০০ একর জমি পেয়েছিলেন রামদেব। মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় তখন ফড়নবিশের বিজেপি সরকার। শুধু কম দামে জমি? আর কী কী দেওয়া হয়েছিল রামদেবকে? নিউজক্লিকের প্রতিবেদন কয়েকটা বিস্ফোরক তথ্য জানাচ্ছে।

ক) These concessions include waiving stamp duty, recompensing the GST that Patanjali would have to pay, and reducing Rs 1 per unit in electricity charges, as the project comes under the MSME category.

খ) Since Bharatiya Janata Party came to power, Ramdev's company has received discounts worth more than $46 million for land acquisitions in states controlled by the BJP, according to Reuters. It has also gained access to a few pieces of land free of charge, says the report.

২২) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আয়ুর্বেদের ওপরে মানুষের যে আস্থা, সেটাকে মূলধন করে রামদেবের মতো মানুষদের ব্যবসা কতটা লাভজনক? ২০১৭ সালের একটা রিপোর্ট অনুসারে, বাবা রামদেবের পতঞ্জলি ভারতের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং এফএমসিজি হয়ে উঠেছে।

ব্যবসা করুন। তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যে চিকিৎসকরা এই কোভিডের সময়ে প্রাণপাত করে লড়ছেন, তাঁদের কেন রাক্ষস বলে অসম্মান করতে হবে। কেন অ্যালোপ্যাথিকে ‘স্টুপিড সায়েন্স’ বলতে হবে? কেন বিভ্রান্ত করে দেশের সাধারণ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হবে মৃত্যুর দিকে?

এতগুলো প্রশ্নের একটাই উত্তর— ‘গন্দা হ্যায় পর ধান্দা হ্যায় ইয়ে।’ আর এই ধান্দার শরিক আমাদের রাজনীতিকরাও, যাঁদের স্নেহের হাত মাথার ওপরে আছে বলেই রামদেবের মতো লোক দেশের আইন–আদালতকে ফুৎকারে উড়িয়ে বলতে পারে, ‘ কারও বাবা আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না।’

সেই হিসেবে রামদেব নামক লোকটা নির্লজ্জ ধান্দাবাজ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।যিনি এই ছবির মতোই আমাদের দেশের আইন–আদালতের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করে বিদ্রুপের হাসি হেসে যাচ্ছেন,

সাপোর্টিং লিংক (উদাহরণের ক্রম অনুসারে)

১) https://in.mashable.com/culture/22191/watch-ramdev-baba-make-light-of-covid-19-patients-struggle-for-oxygen-and-try-not-to-slap-the-screen

২) https://www.newindianexpress.com/nation/2021/may/27/up-bjp-mlabacks-ramdev-over-remarks-on-allopathic-medicine-calls-doctors-rakshas-2308391.html

এবং

https://www.scoopwhoop.com/these-5-products-are-patanjalis-most-popular-contribute-the-maximum-to-its-revenue/?ref=?ref=page_search

৩) https://www.thequint.com/news/webqoof/baba-ramdev-covid-misinformation-vaccine-coronavirus

৪) https://www.scoopwhoop.com/news/opposition-rajya-sabha-baba-ramdev-male-child/?ref=?ref=page_search

৫) https://www.oneindia.com/2008/02/02/non-veg-food-is-injurious-to-health-baba-ramdev-1202057971.html

৬) https://www.youtube.com/watch?v=nQGgZ-D7n7Y

এবং

https://www.scoopwhoop.com/now-baba-ramdev-launches-his-own-private-security-firm/?ref=?ref=page_search

৭) https://www.businessinsider.in/india/news/indian-banks-might-never-recover-68607-crore-of-bad-loans-says-rti-data/articleshow/75419516.cms

৮) https://www.indiatoday.in/india/story/e-agenda-aajtak-yoga-guru-ramdev-coronavirus-patient-hold-breath-pandemic-1670920-2020-04-25

৯) https://zeenews.india.com/delhi/do-yoga-to-cure-the-urge-of-becoming-terrorist-says-ramdev-2032893.html
১০) https://www.scoopwhoop.com/Baba-Ramdevs-Patanjali-Faces-Government-Flak-For-Ads-Violating-The-Advertising-Code-Of-India/?ref=?ref=page_search
১১) https://bangaloremirror.indiatimes.com/news/india/yoga-guru-ramdev-who-had-said-that-he-would-have-beheaded-laksh-of-people-for-not-chanting-bharat-mata-ki-jai-slogan-was-booked-by-the-hyderabad-police-today-/articleshow/51825339.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

১২) https://www.deccanchronicle.com/131211/news-current-affairs/article/homosexuality-disease-yoga-can-cure-it-ramdev
১৩) https://www.indiatoday.in/india/story/ramdev-says-denied-nobel-prize-because-he-is-black-twitter-goes-berserk-271947-2015-11-07
১৪) https://www.scoopwhoop.com/Amit-Shah-Defends-Baba-Ramdevs-Statement-About-Beheading-People-Not-Saying-Bharat-Mata-Ki-Jai/?ref=?ref=page_search
১৫) https://www.youtube.com/watch?v=URWtBZTkjEE
১৬) https://ndtv.in/videos/baba-ramdev-calls-pm-narendra-modi-rashtra-rishi-456167
১৭) https://www.thequint.com/news/webqoof/baba-ramdev-covid-misinformation-vaccine-coronavirus#read-more
১৮) https://www.scoopwhoop.com/news/baba-ramdev-unveils-coronil-ayurvedic-medicine-to-treat-coronavirus/?ref=page_search
এবং
https://www.scoopwhoop.com/news/never-said-coronil-can-cure-corona-patanjali-takes-u-turn-on-claims-of-treating-virus/?ref=page_search
১৯) https://www.thequint.com/news/india/haryana-government-anil-vij-coronil-baba-ramdev-free-covid-patients
২০) https://www.scoopwhoop.com/as-mp-burns-agriculture-minister-does-yoga-with-ramdev-asks-farmers-to-do-the-same/?ref=?ref=page_search
২১) https://bangaloremirror.indiatimes.com/bangalore/cover-story/bhelsmaharashtra-land-will-produce-soybean-for-baba-ramdev-instead/articleshow/70236822.cms
এবং
https://www.newsclick.in/cronyism-maharashtra-govt-offers-patanjali-group-400-acres-land-50-per-concession
২২) https://www.ndtv.com/india-news/yoga-guru-ramdev-gets-cabinet-minister-status-in-haryana-754600
২৩) https://in.finance.yahoo.com/news/patanjali-journey-india-apos-fastest-193807621.html#:~:text=Twelve%20years%20ago%2C%20Baba%20Ramdev,3L%20crore-worth%20FMCG%20sector

"সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম যুগের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় পরম শত্রু আর নেই।"
(পথের দাবি) -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আক্রান্ত মুক্তচিন্তকরা

-অভিষেক দে

ফ্ল্যাশব্যাক ১) দিনটা ছিল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারী।মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কালো দিন হিসেব আজও যা চিহ্নিত। এই দিনে জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল ধর্মের ধ্বজাধারী রক্ষকরা। বড় নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় তাকে। শেষ কথা বলার সুযোগই তাঁকে দেওয়া হয়নি। একটা দন্ডের সাথে পেছনে হাত বেঁধে, জিহ্বায় একটা পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্রুনো কোনোরকম শব্দ করতে না পারে। তারপর তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো সেসময়ের ধর্ম যাজকরা। মৃত্যুর আগে কারাগারে আট বছর তাঁর উপর চলেছিল নির্মম অত্যাচার। ব্রুনোর অপরাধ, তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তাকারী। অন্ধের মতন কোনোকিছু না মেনে সবেতেই প্রশ্ন তুলতে ভালোবাসতেন। ১৫৯১ সালে তিনি ইতালি ফিরে আসার কিছুদিন পর জিওভাননি মচেনিগো নামক একজন ব্যক্তি ব্রুনোর বিরুদ্ধে ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধীতার অভিযোগ আনেন। ১৫৯২ সালের ২২ মে ব্রুনোকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ভেনিশিয়ান ইনকুইজিশনের মুখোমুখি করা হয় (ইনকুইজিশন হলো রোমান ক্যাথলিক গির্জার একটি বিচার ব্যবস্থা, যেখানে ধর্ম অবমাননাকারীদের বিচার করা হতো)। ব্রুনো খুবই দক্ষতার সাথে তাঁর বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করেন ও তাঁর বিরোধীতাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। বেশ কয়েক মাস ধরে জেরা চলার পর ১৫৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রুনোকে রোমে পাঠানো হয়। সাত বছর ধরে রোমে ব্রুনোর বিচারপর্ব চলতে থাকে। এসময়ে তাঁকে নোনা টাওয়ারে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সেই মহা ঐতিহাসিক বিচারকাজের গুরত্বপূর্ণ কিছু নথি হারিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগই সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল এবং ১৯৪০ সালে বিচারকাজের সেসময়ের একটি সার-সংক্ষেপ পাওয়া যায়। এতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো ছিল- (১) ক্যাথোলিক ধর্মমত ও ধর্মীয় গুরুদের মতের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ (২) খ্রিস্টীয় ধর্মমত অনুসারে স্রষ্টার ত্রি-তত্ত্ববাদ, যীশুর মৃত্যু ও পরে আবার শিষ্যদের কাছে দেখা দেয়ার বিষয়গুলো বিশ্বাস না করা (৩) যীশু ও তাঁর মা মেরিকে যথাযথ সম্মান না করা (৪) এই মহাবিশ্বের মতো আরো মহাবিশ্ব আছে, পৃথিবী গোল, সূর্য এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয় এবং এটি একটি নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু নয়- এই ধারণা পোষণ করা।

সেদিনের ধর্মযাজক আজ নেই। নেই সেখানে উপস্থিত সেইসব জনতারাও যারা ব্রুনোকে হত্যার সময় উল্লাসিত হয়েছিল। ব্রুনোকে তারা খুন করেছিল ঠিকই কিন্তু ব্রুনো মারা গিয়ে এই প্রশ্নটা রেখে গেলো যে, "মুক্তচিন্তকদের হত্যা করেও কি মুক্তচিন্তার গতিকে রোধ করা কি আদৌ সম্ভব?"

ফ্ল্যাশব্যাক ২) " সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক, প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানহীন, সেখান কোনো ধর্মগুরুর জীবনীপাঠও বন্ধ হোক। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষার্জন করুক, বৃদ্ধি পাক তাদের জ্ঞানের উন্মেষ, তারা হয়ে উঠুক মুক্তমনা, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানবতাবাদী "।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (Science and Rationalists’ Association of India) দীর্ঘবছর ধরে ওপরের দাবীগুলোতে সরব। কিন্তু চাইলেই তো আর সবকিছু খুব সহজেই পাওয়া সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন- "স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়"। অনেকটা সেইরকম ব্যপার।

স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিবাদী সমিতির এই দাবীদাওয়া আজও মেনে নিতে পারেনি শিক্ষকসমাজের একাংশ এবং বেশকয়েকটি ধর্মীয় সংগঠন। ২০০১ সাল থেকে যুক্তিবাদী সমিতির পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সরস্বতী পুজো ও নবী দিবস পালনকরা বন্ধ হোক। এইকাজ করতে গিয়ে প্রতিপদে বাঁধা এসেছে, মধুসূদন মাহাতোকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ফোনও এসেছে তবুও যুক্তিবাদী সমিতির সহযোদ্ধারা নিজেদের দাবী এবং লক্ষ্যে আজও অবিচল। সুভাষচন্দ্র বসুর একটি উক্তি এখনে স্মরণ করা যাক। উনি বলেছিলেন- "জীবনে সংগ্রাম আর ঝুঁকি না থাকলে জীবনে বেঁচে থাকাটাই ফিকে হয়ে যায়"।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সামান্যতম হলেও আলোর দেখা পাওয়া গেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে "এইসময়" পত্রিকার অনলাইন পোর্টালে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম- "বিশ্ববিদ্যালয় 'ধর্মনিরপেক্ষ', মিলল না সরস্বতী পুজো করার অনুমতি"। সরস্বতী পুজো আয়োজনের অনুমতি দিল না কেরালার এক বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীরা পুজো করতে চাওয়ায় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মনিরপেক্ষ, সেখানে পুজোর অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এরই পাশাপাশি বেশকয়েকটি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এসেছে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমস্তরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধের বিষয়ে। অন্যদিকে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো বন্ধ করার খবর দিল্লির মোট ১০/১৫ টি খবরেরকাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। রইলো কিছু লিংক -1) http://www.sabguru.com/yukthivadi-samiti-demands-to-stay-on-saraswati-puja-in-govt-schools/
2) http://www.matnews.in/national/11330

ফ্ল্যাশব্যাক ৩) ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিনটি কালোদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলো একটি সংবিধানে উল্লেখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে'। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ত্রিপুরার কমলপুর শাখার অন্যতম সংগঠক সহযোদ্ধা দুলাল ঘোষ, মদ্ভাগবদগীতা থেকে রেফারেন্স তুলে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। খুব স্বাভাবিকভাবে এটি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি কট্টর ধার্মীক বা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তাই উন্মত্ত ধার্মীকদের দল চড়াও হয় দুলাল বাবুর বাড়ি। আসবাবপত্র ভাঙচুর থেকে দুলাল বাবু এবং তার পরিবারেকে হেনস্তা ও শারীরিক নিগ্রহ করে। এরপরে দুলাল ঘোষের পরিবার কমলপুর থানার অফিসার ইনিচার্জকে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ জানিয়ে চিঠি লেখেন। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়, SDM- Kamalpur Dhalai, SDPO -Kamalpur Dhalai, DM-Dhalai Ambassa, SP- Dhalai Ambassa সহ বেশকয়েকটি যায়গায় ও মিডিয়ায়। উক্ত ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ, ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চ সমেত অনেকগুলো সংগঠন। শোনা গেছে, পুলিশ প্রশাসনের অপদার্থতায় অপরাধীরা নাকি এখনও বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে, নাগরিকদের ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন - (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় অধিকার (সংবিধান আমজনতাকে দিয়েছে ধর্মপালন বা ধর্মাচারণ করার স্বাধীনতা কিন্তু সেটা কখনওই প্রকাশ্যে নয় বরং একান্তে এবং অবশ্যই উগ্রতাবিহীন) (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) শাষনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে চালু হয়। এবং ১৯৭৬-সালের ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে ' Secular ' শব্দটা যুক্ত হয়। ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে ' ধর্মনিরপেক্ষ ' (Secular) শব্দটি ব্যাবহার করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে - "We The People Of India, having solemnly resolved to costitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens;" অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি। আবার সংবিধান জানাচ্ছে, প্রতিটি নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। "It shall duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform.{Article 51A(h)Part iv A}"। দুলাল বাবু সংবিধানকে সম্মানে করেন বলেই আর্টিকেল ৫১ এ(এইচ) পার্ট-৪এ কে স্মরণে রেখেই মদ্ভাগবদগীতা থেকে শুধু প্রশ্ন তুলেছিলেন যেটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কারন, একমাত্র মুক্তমনারা কোনোরকম অন্ধবিশ্বাসে বশ না হয়ে প্রশ্ন তোলেন, সঠিক প্রমাণভিত্তিক যুক্তি খোঁজেন অন্যদিকে সবকিছু বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়া ধার্মীকদের স্বভাব।

সেদিন দুলাল ঘোষ সমেত অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "চমকে,ধমকে, অস্ত্র দেখিয়ে কিংবা কোপ মেরে কি মুক্তচিন্তকদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যায়?"

ফ্ল্যাশব্যাক ৪) সম্ভবত ২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে তথ্য তুলে ধরে সরস্বতীপুজো সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন গবেষক, সুলেখক এবং দলিতদের ন্যায্য অধিকারের দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী শরদিন্দু বিশ্বাস

ওরফে শরদিন্দু উদ্দিপণ। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি র মতন উনিও দাবী জানিয়েছিলেন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক ধর্মমুক্ত সেখানে সমস্তরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মগুরুদের জীবনী পাঠ বন্ধ হোক। এতে ধর্মানুভূতী আক্রান্ত হয় ধার্মীকদের। শাস্ত্রগ্রন্থর সত্য (যা ধর্মবেত্তা কিংবা ব্রাহ্মণরা জানাতে চায় না) প্রকাশ পাওয়া দেখে ভীত হয়ে তারা কলকাতা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ জানায় এবং নরেন্দ্রপুর থানায় এফআইআর করে। এরফলে ০৩/০২/২০২২ সকাল সাড়ে বারোটা নাগাদ নরেন্দ্রপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুশোভন সরকারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ শরদিন্দু বাবুর বাড়ির দরজায় গিয়ে ডাকেন এবং দরজা খুলে দিলে শরদিন্দু বাবুকে ধাক্কা মেরে বিনা নোটিশে ওনার ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে মোবাইল তুলে নেয় এবং ল্যাপটপ, বইপত্র ইত্যাদি ঘাটতে শুরু করেন। অবশেষে জোরপূর্বক তাঁকে নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে শরদিন্দু বাবুর অনুগামীরা ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা নরেন্দ্রপুর থানায় ধিরে লধিরে জড়ো হতে থাকেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বড়বড় উকিল এসে থানার বড়বাবুকে প্রশ্ন করা শুরুকরলে অবশেষে ৬ ঘন্টা পর শরদিন্দু বাবুকে এফআইআর এর কপিতে সই করিয়ে থানা থেকে ছাড়া হয়। ওনার নামে আইপিসি ৫০৪, ৫০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়। গত ০৭/০২/২০২২ তারিখে তিনি কোর্টে উঠলে তাঁকে জামিন দেয়া হয়।

গত ০৮/০২/২০২২- এ, AISA, APDR, AIPWA, CPI(ML) লিবারেশন সহ বেশকয়েকটি গণসংগঠনের সদস্যরা নরেন্দ্রপুর থানায় গিয়েছিলো শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে ওই অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে। কিন্তু
কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা বিক্ষোভকারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। শোনা গেছে ছাত্র সংগঠন AISA-র মহিলা কর্মীদের ওপর পুরুষ পুলিশরা অত্যাচারও নাকি করেছেন (যেটা আআইনত দণ্ডনীয় অপরাধ)। এছাড়া সেদিনই সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন দলের রাজ্য কমিটির নেতা মলয় তেওয়ারীসহ ১৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। এই ঘটনাগুলো প্রামাণ করে মুক্তচিন্তকদের ওপর এভাবেই আঘাত চলছে, চলবেও।

খ্রিস্টজন্মের ৫০০ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাকু, সিমেন্ডের মতো গ্রীক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা জানিয়েছিলেন, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে। এইকথাগুলো বলবার বিনিময়ে ধর্ম- বিরোধী, ঈশ্বর- বিরোধী, নাস্তিক মতবাদ প্রকাশের অপরাধে এঁদের বরণ করতে হয়েছিল অচিন্তনীয় নির্যাতন, সত্যের ওপর অসত্যের নির্যাতন, ধর্মের নির্যাতন। উক্ত মতকে ২০০০ বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপারনিকাস। তাঁরই উত্তরসূরি হিসেবে এলেন জিওর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলি সহ অনেকেই। প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে — "সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো"।

বিগত কয়েক দশকে আমরা দেখেছি মুক্তচিন্তকদের ওপর কট্টর ধার্মীকদের আক্রমণ। আমরা হারিয়েছি- অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, নিলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় (নীলয় নীল), অনন্ত বিজয় দাস, ফয়সাল আফেরিন দীপন,
নাজিমুদ্দিন সামাদ, রাজিব হায়দার,শাফিউল ইসলাম, শাহজাহান বাচ্চু, রেজাউল করিম সিদ্দিকি, জুলহাজ মান্নান, মাহবুব রাব্বি তনয়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মীর সানাউর রহমান, গোবিন্দ পানসারে, এম.এম.কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশ, নরেন্দ্র দাভলকার সহ অনেকে। কিন্তু এতো হত্যা করেও কি মুক্তচিন্তকদের অগ্রগমন রোধ করা গেছে কি? কট্টরপন্থী ধার্মীক বা মৌলবাদীদের কাছে এই প্রশ্ন রেখে গেলাম।

পরিশেষে জানাই, যুক্তির বা সত্যের পথে অনেক কাঁটা বিছানো। তবুও আমরা চলেছি সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করেই। আজ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার বিচারে নাস্তিক /অধার্মিক / যুক্তিবাদীরা তৃতীয় স্থানে (সূত্র- মনোরমা ইয়ারবুক ২০১৯। যাকে মান্যতা দেয় ওয়ার্ল্ড অ্যালম্যানাকও)। ২০১২ সালের 'উইন গ্যালপ গ্লোবাল ইনডেক্স অফ রিলিজিয়ন রিপোর্ট' অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ছিল ঘোষিত নাস্তিক। এই হিসেবে ১৩০ কোটির ভারতে নাস্তিকদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। মুক্তমনা, যুক্তিবাদী মানুষের জয় নিশ্চিত। তাদের দুর্বার গতিকে আটকানোর সাধ্য নেই কারোরই।

বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মন্ডলের সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্নোত্তর

[হৃদয় মন্ডলকে এই প্রশ্নোত্তরের ভিডিওটির জন্য গ্রেফতার করা হয়, পরবর্তীতে মুক্তচিন্তকদের চাপে জামিন দিতে বাধ্য হয়]

মুন্সিগঞ্জ সদরের বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের সাথে তাদের বিজ্ঞানের সিনিয়র বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মন্ডলের সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্নোত্তরের একটি ভিডিও সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে। প্রায় ১৩ মিনিটের এই টেপটি ওই ক্লাসের ছাত্রদেরই রেকর্ড করা, যেটা পরে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের প্রশ্নোত্তরের পুরো ট্রান্সক্রিপটি আজ পড়লাম। এইটা যদি উদ্যেশ্যপ্রণোদিত না হয়ে স্বপ্রনোদিত হয়ে জানার আগ্রহ থেকে হতো তাহলে এইটা হতে পারতো একটা উদাহরণীয় ছাত্র শিক্ষকের প্রশ্নোত্তর।

আমি অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষকও এতটা ধৈর্যের সাথে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে এমনভাবে ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো না। আমি আরো হলপ করে বলতে পারি বাংলাদেশের খুব কম শিক্ষার্থীদের কপালেই এমন অসাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষক জুটেছে। কিন্তু এইখানে এমন ঘটনা ঘটেছে যা কোন সভ্য দেশে কল্পনাতীত। এমনকি ১০-২০ বছর আগের বাংলাদেশেও কল্পনাতীত। এখানে নতুন একটি ঘটনা ঘটে। দশম শ্রেণীর সেই ক্লাসের কোন এক ছাত্র গোপনে হৃদয় বণিকের এই বক্তব্য রেকর্ড করে। চিন্তা করে দেখুন কেমন মানের ছাত্র আমরা এখন পয়দা করছি যে আপন শিক্ষককে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করে শিক্ষককে প্রশ্ন করা হয় এবং উদ্যেশপ্রণোদিত ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর রেকর্ড করা হয়।

হৃদয় মন্ডলের সাথে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পড়ে আমার মনে হয়েছে এই শিক্ষককে বাংলাদেশের সেরা শিক্ষক হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। অথচ যেই কারণে তার সেরা শিক্ষক হওয়ার কথা সেই কারণে সে নিগৃহীত হচ্ছে। নিচে প্রশ্নোত্তরের কথোপকোটনটি কাট & পেস্ট করলাম। যেটি পড়লে জানবেন যে শিক্ষার্থীরা এক পর্যায়ে শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলকে "প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ" বই পড়তে উপদেশ দিচ্ছে। এই বইই আমাদের নতুন প্রজন্মকে শেষ করে দিচ্ছে। এই বই পড়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞান বিমুখ হচ্ছে। অথচ এই বইকে আমাদের বিজ্ঞানের বড় বড় শিক্ষকরাও প্রমোট করছে। এরা নিজেরাতো কূপমণ্ডূকতায় ভুগছেই সাথে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অন্ধকারে ধাবিত করছে।

"[00:00]

স্যার: কেউ দেখেছে? কোন কিছুইতো কেউ দেখেনি। এটা তারা বিশ্বাসের উপর রেখেছে। তোমরা যখন বিজ্ঞান আরো পড়বে তখন দেখবে বিজ্ঞানে আরো কতকিছু আসছে। আসলে আমরা বুঝে উঠতে পারি না বা চাই না সত্য জানতে। দেখো উন্নত বিশ্ব ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। আর আমরা ধর্মান্ধ হচ্ছি।

[00:35]

ছাত্র: বহু ধরনের কথা ও থিওরিতো ধর্ম থেকেই এসেছে। বিজ্ঞানীরা ধর্ম থেকে এসব আবিস্কার খুঁজে পেয়েছেন।

স্যার: কোন কথা ধর্ম থেকে নেয়া হয়নি। কোনভাবেই না। বরং বিজ্ঞান থেকে নিয়ে ধর্ম চলছে, ধর্ম বানানো হয়েছে।

[01:10]

ছাত্র: আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (স:) বহু বিজ্ঞানের সকল উৎস দিয়ে গেছেন। সাড়ে চার হাজার বছর আগে আমাদের হযরত মোহাম্মদ (স:) এসব বিজ্ঞানের কথা বলে গেছেন।

স্যার: সাড়ে চার হাজার বছর আগে কীভাবে? হযরত মোহাম্মদ তো ছিলেন সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে। বিজ্ঞানীরা আবিস্কার শুরু করেছেন বহু আগে থেকে। মানে হযরত মোহাম্মদের আমল থেকেই বিজ্ঞান শুরু হয়েছে এমনটা তো নয়।

[01:30]

ছাত্র: হ্যাঁ স্যার, হযরত মোহাম্মদ (স:) এর পূর্বে যারা বলে গিয়েছেন তাদেরটায় কোন যুক্তি পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (স:) যা বলে গেছেন তা সব যুক্তিপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছে।

স্যার: হযরত মোহাম্মদ এমন কী বলে গেছেন যার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা তার কাছ থেকেই পেয়েছেন? এমন কোন আবিস্কার ছিলো যা বিজ্ঞানীরা আগে করতে পারেননি?

এটা বিজ্ঞানের ক্লাস, ধর্মের ক্লাস নয়। বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত। আর ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস।

[02:00]

ছাত্র: স্যার আছে, অনেক প্রমাণ আছে যে ধর্মই বিজ্ঞানসম্মত।

স্যার: ধর্মের কোন প্রমাণ নেই। শেষমেশ ধর্মের ব্যখ্যা কোথায় যায় জানো? শেষমেশ ওই ঈশ্বর দেখে, ঈশ্বর সমাধান দেবেন, পরকালে বিচার হবে। এসব বিশ্বাসের বিষয়। কোন প্রমাণ নেই।

[02:15]

ছাত্র: একটি বই আছে, পড়বেন। নাম হচ্ছে 'থিওরি অব এভরিথিং'। পাবেন ডিমের ভেতর কুসুম কীভাবে আছে তা আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছে।

স্যার: আমি সব পড়েছি। না পড়লে কি বিজ্ঞান পড়ানোর শিক্ষক এমনিই হয়েছি? এগুলো সব গোঁজামিল দাবী। ওই বইয়ে এমন কিছুই লেখা নেই। বস্তুত ধর্ম মানুষের লেখা। সব ধর্ম মানুষের লেখা।

[02:45]

ছাত্র: স্যার বিজ্ঞানও তো মানুষের লেখা।

স্যার: হ্যাঁ বিজ্ঞান অবশ্যই মানুষের লেখা।

[02:55]

ছাত্র: স্যার, ধর্মের প্রমাণ আছে।

স্যার: ধর্মের কী প্রমাণ আছে আমাকে দেখাও।

[02:04]

ছাত্র: কী যে বলেন স্যার! সারা বিশ্বে মুসলিমদের নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সবাই দেখে ইসলামই সত্য। এটাই সত্য ধর্ম আর বাকি সব মিথ্যা। এটা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছে।

স্যার: কোরআন যদি বিজ্ঞানের উৎস হয়ে থাকে তবে দেখাও কোরআন পড়ে কতজন বিজ্ঞানী হয়েছেন? পৃথিবীর ৯০% বিজ্ঞানী খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টান পরিবার থেকে আসা।

[03:24]

ছাত্র: স্যার আমরা যেটাকে ধর্ম বলছি, এটাকে যদি আমরা [বিজ্ঞানের] দিকে নিয়ে যাই তবে সেটাই বিজ্ঞান। আর যদি বিজ্ঞানকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাই তবে ওটাই বিজ্ঞান। মূল কথা হচ্ছে দুটোই এক জিনিস।

স্যার: এই যে খ্রিষ্টানরা এতোকিছু আবিস্কার করে, তাদের ধর্মের নিয়ম সেভাবে কেউই মানে না। তারা কি ধর্ম ব্যবসা করতে পারে না? অবশ্যই পারে। তারা ধর্ম ব্যবসা করছে কি? তারা ধর্মের ধারেকাছেও নেই। তারা আছে আবিস্কার নিয়ে। এই মুসলমানরা এগিয়ে যেতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকতে হবে। ধর্মান্ধতা বাড়লে সেটা সম্ভব নয়। এই চৌদ্দ শত বছর আগে ইসলাম এসেছে। বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে ২০০ থেকে ৩০০ বছরে। তাহলে এতোদিন হুজুররা কী করেছেন? কী আবিস্কার করেছেন তারা?

[04:40]

ছাত্র: শুরু থেকেই হুজুররা যা বলতেন তাই বিজ্ঞান হিসেবে মেনে নেয়া হতো।

স্যার: তোমাদের হুজুররা বিজ্ঞানের কী পড়েছেন? কী জানেন? তারাতো বিজ্ঞান পড়েইনি সে অর্থে। এই যে ডারউইনের কথা বললাম, ডারউইন কি ধর্ম পড়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন?

[05:08]

ছাত্র: স্যার, ডারউইন যে ধর্ম পুস্তক পড়েনি তার প্রমাণ কী স্যার?

স্যার: আরেহ ধর্ম পুস্তক পড়েই না ওরা বেশিরভাগ।

[05:10]

ছাত্র: স্যার, নাস্তিক ঠিক আছে। কিন্তু ওরা ধর্মের পুস্তক পড়েই এসব আবিস্কার করেছে। ধর্মের প্রমাণ পেয়েছে ওরা।

স্যার: আরেহ আবিস্কারগুলো ধর্ম পুস্তক থেকে আসেইনি। কোন সুরা কোন হাদিসে আছে আবিস্কারের কথা? আবিস্কারের সূত্র? ধর্মটাতো কাল্পনিক বিশ্বাস। বাস্তবতার সাথে ওর সম্পর্ক কী? হ্যাঁ স্রষ্টা আছেই। স্রষ্টা না থাকলে গাছপালা কোথা থেকে এলো? এই গাছপালাগুলো তো মানুষ সৃষ্টি করেনি। মাটি মানুষ তৈরি করতে পারে না। মায়ের পেটে বাচ্চা মানুষ তৈরি করতে পারে না,

ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া। পাওয়ারতো থাকতে পারে। পাওয়ার থাকলে সেটা কার? সেটাই আল্লাহ, সেটাই ঈশ্বর। এই যে হযরত মোহাম্মদ। এরা কী? এরা হইলো মহাপুরুষ। এরা কেউ ঈশ্বর নন।

[06:15]

ছাত্র: এরা আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন।

স্যার: নৈতিক জ্ঞান হয়ত। ধর্ম মানুষকে জীবনযাপন এর কিছু নিয়ম বলে দেয়। মানুষ সেটা পালন করে। এর বাহিরে কি কিছু নেই? অবশ্যই ধর্ম পুস্তকের বাহিরে অনেক কিছুই আছে। ধর্ম এসেছেই মানুষকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য। আর কোন কিছুর জন্য নয়।

এই যে স্রষ্টা আছে বলা হয়, আমরাতো দেখিনি। যে জিনিস দেখিনি সে জিনিস নিয়ে মারামারি কাটাকাটির কোন মানে আছে? তোমার বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসের জায়গাতেই রাখো। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রমাণ সাপেক্ষ। বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আর ধর্মে অন্ধ হলে যা হয়, এই গরমে জোব্বা পরে থাকে। এটাতো বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এই যে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাস হয়ে বাতি জ্বলে এটা বিজ্ঞান। এই যে A+B হোলস্কয়ারের সূত্র, এগুলো হিসেব করে মেলানো। এটাই বিজ্ঞান যা প্রমাণ সাপেক্ষ। এগুলো কি ধর্মগ্রন্থে আছে? আমরা অনেক সময় বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে মিলাই যা ঠিক নয়। হ্যাঁ ধর্ম মানুষকে সুশৃঙ্খল রাখে। বিজ্ঞান আলাদা কথা। বিজ্ঞান বিজ্ঞানই।

[08:27]

ছাত্র: 'প্যারাডক্সিকাল সাজিদ' বইটা পইড়েন স্যার। গুগল প্লে স্টোরে পাবেন।

স্যার: আমি পড়েছি। প্রতিনিয়ত আমি বিজ্ঞানের বই পড়ি। এসব গোঁজামিলের বইও আমার পড়া আছে। ওই বই থেকে বিজ্ঞান শিখতে হবেনা আমার। এই যে মুসলমানরা মুসলমানের মত ধর্ম প্রচার করে, হিন্দুরা হিন্দুদের মত আর খ্রিষ্টানরা তাদের মত করেই ধর্মের ব্যখ্যা করে। এই জাত আর ধর্ম নিয়েই দ্বন্দ্ব।

[09:00]

ছাত্র: আমরা যদি বলি, ধর্মের বিভিন্ন জিনিস যুক্ত করে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ক্রেডিট নিচ্ছে?

স্যার: আরেহ বিজ্ঞান তো প্রমাণ দিয়েই আসছে। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী? নেয়া দেয়ার প্রয়োজন কেন আসবে? বিজ্ঞান তো কোন বিশ্বাস নয়।

[09:12]

ছাত্র: আমরা যদি ১৪০০ বছর পেছনে যেতে পারতাম তবে তো আমরা দেখতেই পেতাম আমদের সামনে সব প্রমাণ চলে আসতো।

স্যার: ধর্ম পুস্তক ১৪০০ বছর আগের লেখা। তার আগে কোথায় ছিলো? এর আগে মানুষ ছিল না? সভ্যতা ছিল না? তবে?

[09:26]

ছাত্র: কোরানের আগেও ৩ টি বই ছিলো।

স্যার: যবুর ছিলো, ইঞ্জিল তো ২৫০০ বছর আগের। আর বৌদ্ধদের ছিলো। আমাদের হিন্দু ধর্মের বেদ ছিলো বড়জোর সাত হাজার বছর আগের। তাতে লাভ কী ? মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে। তখন এসব পুস্তক কোথায় ছিলো? তাহলে? এখন আমরা যতটুকু পাই সেটুকু নিয়েই ধর্মের কথা বলি। আমরা এখন ধর্ম নিয়ে গ্যাঞ্জাম করি! কেন করি? আমরা গ্যাঞ্জাম করব না। শিখব, জানব। কোনপ্রকার ঝামেলা করব না ধর্ম নিয়ে। অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন মানে নেই। জিনিসটা হচ্ছে তোমরা বুঝে কাজ করবে। ধর্ম একটা কথা বললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে না। ধর্ম বলল কান নিয়েছে চিলে আর চিলের পেছনে দৌড়াতে হবে ব্যপারটা এমন নয়।

হনুমান নাকি সূর্যটাকে কানের ভেতর রেখেছে। আমাদের হিন্দু ধর্মের যারা বয়স্ক তারা খুব বিশ্বাস করে যে এই হনুমানের কানের মধ্যে সূর্য থাকে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে হনুমান যদি কানের ভেতর সূর্য রাখে তবে পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুন বড় হচ্ছে সূর্য। এই পৃথিবী সূর্যের ১৩ লক্ষ গুন ছোট! এই ছোট পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে হনুমান কিভাবে তার কানের ভেতর সূর্য রাখে?

এই রকম গাঁজাখুরি গল্প যারা করে তাদের গল্প বিশ্বাস করতেই হবে? কেন আমরা এসব বিশ্বাস করব? কমবেশি সব ধর্মের মধ্যেই এরকম গাঁজাখুরি গল্প আছে। আমরা সচেতন থাকবো। এসব বলতে গেলেই বিতর্ক। যাক তোমাদের পড়ানো শুরু করি। এসব বিতর্কে যেয়ে লাভ নেই।

ধর্মের ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে। ভালো না থাকলে খারাপ এলো কোথা থেকে? এই যে দিন দেখতে পাচ্ছো, এই দিন কীভাবে এলো? রাত আছে বলেই তো আমরা দিন বলতে পারি।
এই যে কালো ব্যাগ, এটা কালো তুমি বুঝলে কীভাবে? এই যে লাল ব্যাগ, তোমরা সবাই কেন লাল দেখতে পাচ্ছো?
এই যে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এরকমই স্পষ্ট বিষয়। বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতা।
এই গাঁজাখুরি গল্প করে, এসব কারা করে? খারাপ মানুষেরা করে।
এই গাঁজাখুরি গল্প খারাপ মানুষগুলো করে তাদের ব্যবসা টেকানোর জন্য।
এই যে হনুমানের গল্প, হিন্দুদের মধ্যে যারা পড়াশোনা করে তারা কিন্তু এসব বিশ্বাস করে না। যারা মূর্খ লোক আছে তারাই এসব বিশ্বাস করে। কিছু লোক আছে ঘুরেফিরে খায়। সারাদিন কাজ করে না। এরে ওরে এটা সেটা বলে বাটপারি করে অন্ন যোগায়। ওরাই এই মূর্খদের শিষ্য বানায়। এরপর বসে বসে খায়। তারাই বলে হনুমানের কানে সূর্য আছে আর এসব শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের টাকাপয়সা দেয়।
এই যে তোমরা লেখাপড়া শিখেছো, তোমরা ধর্মের পুস্তক পড়বে। অন্যের কথা শুনে লাফাবে কেন? তোমরা তো মূর্খ নও।
[12:50]
ছাত্র: স্যার আমরা তো কোরআন পড়েই এসব পাচ্ছি। তাছাড়া ওয়াজ শুনি, ওয়াজ শুনেও অনেক কিছুই শিখছি।
স্যার: ওয়াজ যে শোন, ওয়াজে কত ধরনের কথাই বকে, ভেবে দেখেছো? মানুষকে হত্যা করতে বলে, বাজে কথা বলে। হিংসা ছড়ানো হয় খেয়াল করেছো? শুনে ধর্ম মানতে হবে কেন? নিজে পড়েই ধর্ম মানো।"

"যারা অন্ধকার ভয় পায়, তারাই বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করে। আমি অন্ধকারকে ভয় পাই না।"
-স্টিফেন হকিং

উচিত কর্তব্য

-পার্থপ্রতিম পাল

1) সাপের ভয়ে মনসা পূজা না করে,সাপ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিত।

2) শত্রুর ভয়ে কালীপূজা করে সময় নষ্ট না করে,আগে শত্রুকে পরাজিত করার চেষ্টা করা উচিত।

3) সন্তান কামনায় গোপাল পূজা/কার্ত্তিক পূজা না করে,চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত বা সন্তান দত্তক নেওয়া উচিত।

4) পক্সের ভয়ে শীতলাপূজা না করে বাচ্চাদের টিকা/ঔষধ দেওয়া উচিত।

5) গ্রহদোষ কাটাতে শনিপূজা না করে গ্রহ,নক্ষত্রের সম্বন্ধে জানা উচিত।

6) বিপদের ভয়ে বিপদতারিনীর পূজা না করে,বিপদ সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকা উচিত।

7) অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে গাড়ীতে দেবদেবীর ছবি এবং লেবু-লংকা না ঝুলিয়ে বাবা-মায়ের ছবি রাখা উচিত। ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং সদা সতর্ক থাকা উচিত। মৃত বাবা-মাকে অলীক স্বর্গে পাঠাতে লোভী ব্রাহ্মণের ফাঁদে পা দিয়ে,ব্রাহ্মণকে অকাতরে দান-ধ্যান না করে,জীবিতাবস্থায় বাবা-মাকে সেবা করা উচিত।

9) ধন-সম্পদের লোভে লক্ষ্মীপূজা করে ধনী হওয়ার আশা না করে,পরিশ্রমী হওয়া উচিত।

10) গঙ্গাপূজা/ছটপূজার নামে নদীর জলদূষণ না করে,নদীর জলদূষণ প্রতিরোধ করা উচিত।

11) সরস্বতী পূজা করলেই বিদ্যা অর্জিত হবে না, মন দিয়ে পড়াশুনা করা উচিত।

12) ধর্মের নামে পশুবলী না দিয়ে, নিজের পশুত্বকে বলী দেওয়া উচিত।

13) ধর্মের নির্দেশে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা না করে,নিজের ধর্মান্ধতাকে হত্যা করা উচিত।

14) মিথ্যা আশীর্বাদের লোভে এবং মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে ব্রাহ্মণ সেবা না করে মানব সেবা করা উচিত।

15) ধর্মীয় শিক্ষা অপেক্ষা আধুনিক শিক্ষা মূল্যবান।সব ধর্মের মানুষকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষা গ্রহনে বেশী যত্নবান হওয়া উচিত।

16) জঘণ্য, আত্মঘাতী জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথায় ডুবে না মরে, বর্ণপ্রথাকে নির্মূল করা উচিত।

17) পৃথিবীর কোনোও ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ আকাশ থেকে পড়েনি, এসব মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত।
এই চরম সত্যটি সবার স্বীকার করা উচিত।

"যারা আপনাকে অদ্ভুত অলীক কিছুতে বিশ্বাস করাতে পারবে,তারা আপনাকে দিয়ে যে কোনো নৃশংস কাজও করিয়ে নিতে পারে। "

- ভলতেয়ার

KICK

-রুদ্রাণী

সলমন খানের একটা সিনেমা দেখেছিলাম। নাম ছিলো কিক্। আমার মতো অনেকেই হয়তো সিনেমা টা দেখেছেন। সেই সিনেমাতে মোদ্দা কথা ছিলো। জীবনে একটা কিক্ খুব প্রয়োজন। থুরি, থুরি ভুল বললাম, জীবনে চলার পথে মাঝে মধ্যেই কিক্ খাওয়া খুব প্রয়োজন। নাহলে, সহজ সরল জীবনটা কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে পান্তাভাত লাগে। পান্তাভাতের সাথে ঝাল ঝাল কাঁচা লন্কাটাই তো হলো জীবনের কিক্।

অনেকেই বলবেন, আপনি কি পাগল হলেন? সবাই চায় একটা সোজা সরল জীবন। আর কিক্ কথাটাতেই 'পশ্চাতাঘাতে'র গন্ধ আসছে। এরকম একটা 'বস্তু'কে খেতে যাবোই বা কেন?

দূর মশাই আপনি কেন খাবেন? কিভাবে খাবেন? সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। তারজন্য ওত্ পেতে অনেক 'জেরি' আপনার নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে বসে আছে। আপনাকে সেরা কিক্ টি উপহার দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আপনি চাইলে বেষ্ট কিক্ টি দেওয়ার জন্য আপনি আপনার 'জেরি' কে চুম্মা দিতেই পারেন। সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়ার চাহিদায় দু-তিনটি উদাহরণ দিতেই পারি। যেমন ধরুন, আপনি একটি প্লাজমা টিভি কিনে বাড়ি নিয়ে এলেন। আপনি টিভি নিয়ে বাড়ি ঢোকার আগেই তার রূপ-রঙ- আকার-দাম-গুণগত মান সব ইনফরমেশন আপনি যদি কোনও ভাবে ভুলে যান, তাহলে তা আপনি, আপনার প্রতিবেশী থেকে চাইলেই পেয়ে যাবেন। আর এই সুত্র ধরে আপনার প্রতিবেশী থেকে আপনি কোনও কিক্ উপহার হিসেবে পেতেই পারেন। অথবা ধরুন অফিসে আপনার পদোন্নতি হলো। এবার তৈরী হয়ে যান, একটি বেষ্ট কিক্ উপহার হিসেবে সহকর্মীদের থেকে পাওয়ার জন্য। সে উপহার দেওয়ার সহকর্মীর অভাব ও পড়বে না। আচ্ছা অতোদূর যাবো কেন? আপনার সংসারেই আপনি কিক্ খেতে পারেন আপনার 'খুব কাছের এবং প্রিয় লোকজন' থেকে। আর বন্ধুত্বের যেমন বয়সের সীমা থাকে না। তেমনি এই কিক্ দেওয়ার লোকজনের ও বয়সের সীমাবদ্ধতা বা কোনো লিঙ্গভেদ থাকে না।

লেখা টা পড়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, কিক্ খেতে না চাইলেও, খেতে আপনাকে হবেই। আরে মশায়, এই কিক্ ছিলো, আছে বা থাকবে বলেই তো জীবনটা কত্তো রঙিন। ভাবুন তো একবার, এই যে, আমাদের সবার প্রিয় টম-জেরি। তাদের মধ্যে এই কিক্ এর দেয়া-নেয়া না থাকলে, এই গল্পটা এতো চিত্তাকর্ষক হতো? ছেড়ে দিন, ইংরেজী চরিত্র দের। সাধারণ টেলি সিরিয়াল গুলোকেই দেখুন না। রোজ সন্ধ্যায় যাদের জন্য চোখের জল ফেলে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। তাদের জীবনে দেখানো কিক্ গুলোই কিন্তু আপনাকে দর্শক হিসেবে ধরে রাখছে, বা সিরিয়ারটির TRP বাড়াচ্ছে।

আমি আর আমার মেয়ে, সম্প্রতি একটু রিলাক্সেশনের জন্য একটা সিরিয়াল দেখি। তার নাম হলো তেনালি রামা। শুনলাম, মানে আমার মেয়ে জানালো, যে তেনালির পারিশ্রমিক নাকি ৫৫ হাজার টাকা আর তার ঠিক নিচে তার চিরদিনের শত্রু তথ্যাচার্যের পারিশ্রমিক ৫০ হাজার টাকা। আর কারো চল্লিশের উপর নয়। কি বুঝলেন বন্ধুরা? এই তথ্যাচার্য না থাকলে তেনালির কোনো দাম নেই।

তাইলে, খাঁড়াইলটা হইলো, প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যেকে যদি হিরো হয় (লিঙ্গভেদ করলাম না, কারণ আমার মতে হিরো একটা পদের নাম)। তাহলে তার সঙ্গে অবশ্যই একজন (একাধিক হয়ে থাকে) ভিলেন থাকবে। যার অবিরাম এবং অনুচ্চারিত প্রয়াসের ফলে জীবনের শেষ অধ্যায়ে আপনি আপনার অলিখিত পুরস্কার গুলি কে মনের মনিকোঠায় সযত্নে লালন করে থাকবেন।

সেই কথায় আছে না? 'চলিতে না শেখে কেহ, না খাইয়া আছাড়' আমাদের জীবনে ও এই আছাড় দেওয়ার লোকজনের খুব দরকার। অর্থাৎ এই কিক্ এর খুব প্রয়োজন। ওরাই আপনাকে জীবনের অনেক কিছু শেখাবে। তাই বুদ্ধি বাড়াতে বাদাম না কিনে, এই কিক্ দেওয়ার লোকজনকে অতি আদরে কাছে রাখুন। কথা দিলাম, জীবনের পথে এগিয়ে যেতে এরাই আপনার একমাত্র সহায়ক।

সর্বশেষ আমি আমার সব 'জেরি'দের জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। তোমরা আছো বলেই তো আমি আছি।

আপনি ও আপনার জেরিদের পুষে রাখুন, জীবনের পথে নিজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য। এদের জন্য মন খারাপ করলে আপনি ও সেই কস্তুরী থাকা হরিণের মত হয়ে যাবেন। যে নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনে। চরৈবেতি।

জানা-অজানা বিজ্ঞান

-দেবব্রত দাস (জীব রসায়নে স্নাতকোত্তর)

জানো কি বেনীমাধব? সাদা কাপড় ওয়াশ করার পর কেন নীল রঙ বা উজালা ব্যবহার করা? কাপড় কাচার পর ডিটারজেন্ট (প্রায় সব প্রকার ডিটারজেন্ট এ সালফেটেড কোকোনাট অয়েল মনোগ্লিসারাইড (Sulphated Coconut oil Monoglyceride- ৩১.৫% অ্যানহাইড্রাস সোডিয়াম সালফেট (Anhydrous Sodium Sulphate - 65.৯%) এ সালফার (S)এবং জলে আইরন লবন (FeSO4) থাকার জন্য জামাকাপড়ে একটু হলদে ভাব তৈরি হয়ে থাকে, নীল হলো হলুদ বর্ণের পরিপূরক, দুটি বর্ণ মিশে সাদা বর্ণের সৃষ্টি হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে। এই কারণে উজালা বা ব্লু মেশানো হয়,

জানো কি বেণীমাধব, উচ্ছে বা করলা কেনো তেতো লাগে? করলা উচ্ছে এগুলো ফল জাতীয় সবজি। পাকলেও এর সব তেতো। কারণ এটা momordician গ্রুপের ফল, এই গ্রুপের আপেল, তরমুজ, স্কোয়াশ সব ই তেতো। কারণ এতে মোমোরডিসিন এবং কিউকারবিটাসিন biochemical থাকে, তার জন্য এই স্বাদ। তবে এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, বাত ও ডায়াবেটিস নিরাময়ে momordicin দারুন কাজ করে।

মুলো খেলে পাদ হয় এই কথাটি কতটুকু সত্যি?

মূলার পাশাপাশি বাঁধাকপি পরিবারের সব সদস্যই অতিরিক্ত বাতকর্মের উদ্রেক করে। কারণ এগুলোতে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার থাকে যা মানুষের পরিপাকতন্ত্রে হজম হওয়া কষ্টসাধ্য । প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার পেটে গেলে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত হজম না হয়ে চলে যায়। বৃহদন্ত্রে ফাইবারের হজম প্রক্রিয়া শুরু হলে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয় । ফাইবার ছাড়াও মূলায় ফ্রুকট্যান নামক শুগার থাকে । এই শুগারকে হজম করতে উৎসেচক (Enzyme) লাগে সেটা মানুষের পাকস্থলিতে নেই । এটাকে হজম করতে গিয়ে যে কর্মযজ্ঞ হয় তা হজম না হলেও প্রচুর গ্যাস তৈরি করে । এই জন্য মূলা খেলে অতিরিক্ত বাতকর্ম হয় ।

পেঁয়াজ কাটলে চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন?

পেঁয়াজে সালফারযুক্ত বিভিন্ন ধরণের যৌগ থাকে, এর মধ্যে একটি হল অ্যামিনো এসিড সালফোক্সাইড (amino acid sulfoxide)। পেঁয়াজ কাটলে এর কোষের ভেতরের অ্যালিনেজ (allinase) নামক এনজাইম বের হয়ে আসে, যা amino acid sulfoxides যৌগগুলোকে উদ্বায়ী সালফোনিক এসিড (sulfenic acid) এ পরিণত করে; যা চোখের জলের সংস্পর্শে আসামাত্র syn-propanethial-S-oxide নামক যৌগ তৈরী করে, এটিই চোখে জল আনার জন্য দায়ী। সহজ কথায়, চোখের জলের সংস্পর্শে মৃদু সালফিউরিক এসিড তৈরী হয়, তাই চোখ জ্বালাপোড়া করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জ্বালাপোড়া এর অনুভূতি কর্ণিয়ার উপরে থাকা free nerve ending (যেখানে অনেকগুলো স্নায়ু একত্রে এসে মিলিত হয়) এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক সনাক্ত করে থাকে, তারপর সিলিয়ারি নার্ভ (cilliary (nerve) দিয়ে এই অনুভূতি বাহিত হয়ে প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভ (parasympathetic nerves) হয়ে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড (lacrimal gland)-কে উত্তেজিত করে। ফলে চোখ দিয়ে জল পড়ে।

দুধ গরম হওয়ার পরে উপচে পড়ে যায় কেন?

দুধের উপাদানগুলো হলোঃ

> জল (৮৭%)

> প্রোটিন (8%)

ল্যাক্টোজ বা দুধের চিনি(৫%)

> মিনারেল ও অন্যান্য উপাদান।

যখন দুধ গরম করা হয় তখন মিনারেল, প্রোটিন, ফ্যাট উচ্চ তাপে ভেঙে আলাদা হয়ে যায়। এগুলো দুধের চেয়ে হালকা, তাই উপরে ভেসে ওঠে। একেই আমরা দুধের সর বা ক্রিম বলি।
তো উচ্চ তাপে কিছু পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু কিছু সময় পরে উপরে যে ক্রিমের আস্তরণ আছে সেটা ভেদ করে আর বাষ্প বের হতে পারে না। কারণ এ ক্রিমের ফ্যাট,মিনারেলের স্ফুটনাংক জল অপেক্ষা বেশি। তাই ওগুলো জলের মতো ফুটতে শুরু করে না। সুতরাং, দুধের জলীয় বাষ্প তার উপরের স্তর ভেদ করতে না পারায় আটকে যায়।যতই তাপ দেয়া হয় ততই জলীয় বাষ্প উপরে উঠে আর এ বাষ্পীভূত বুদবুদ উপরে চাপ দেয়।আরও গরম করা হয় তখন জলীয় বাষ্প দুধের উপরের স্তরকে ঠেলে উপরে তুলে দেয়। এর কারণে দুধের সর ও কিছু দুধ উপচে পড়ে যায়।

বাঙালির, অতীত-বর্তমান- ভবিষ্যৎ

-অভিষেক দে

দিনকয়েক আগেকার কথা। কিছু প্রয়োজনীয় কাজে গিয়েছিলাম আসানসোলে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মা একটা চিরকুটে কয়েকটা জিনিসের নাম লিখে দিয়ে বলেছিল সময় পেলে আসানসোল বাজারে ঢুকে জিনিসগুলো কিনে আনতে। কাজ সেরে বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ বাজারে ঢুকে উক্ত জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল (অবশ্য এই অভিজ্ঞতা আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে)। এইখানে জানিয়ে রাখি আমার জন্ম এবং বেড়েওঠা আসানসোলে। বর্তমানে দুর্গাপুর শহরে আপাতত স্থায়ী ঠিকানা হলেও, জীবনের ২৯ টা বছর কাটিয়েছি এখানে। শহরটাকে হাতের তালুর মতন চিনি। এখানে অনেকেই আমাকে যেমন বেশ ভালোরকম চেনেন তেমন ভালোওবাসেন।

যাইহোক মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আসানসোলে বাজারে একটা বহুপুরোনো মাড়োয়ারি ব্যক্তির দোকান রয়েছে। দোকানে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে বানানো বিভিন্ন পাঁপর, চিপস, বিউলিডাল বড়ি ইত্যাদি পাইকারি দরে বিক্রি হয়। দোকানে একজনই কর্মচারী, বাঙালি (বয়স আন্দাজ প্রায় ২৪)। দোকানে কিছুটা ভীড় থাকায় দাঁড়াতেই হলো। মাড়োয়ারি ব্যক্তিটি তার কর্মচারীকে বারেবারে তাড়া দিচ্ছিল কারন আমাকে বাদ দিলে বাকি সবাই চরম ব্যস্ত যে। দোকানদার, বাঙালি ছেলেটির উদ্দ্যেশ্যে বলছে -"আরে বিট্টু, থোড়া হাত জলদি চালাও। আজ কুছ খায়াপিয়া নেহি ক্যায়া। ইতনা ঢিলা কাম করনে সে তুম মেরা দুকান মে হি তালা লগবা দোগে"।

খুব খারাপ লাগছিল ছেলেটির এই দুর্দশা দেখে। খোঁজ নিলাম, মাত্র ৪৫০০ টাকা (যা আজকের মুদ্রাস্ফীতির বাজারে অপ্রতুল বলাই যায়) র জন্যে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত (মানে ১২ ঘন্টা) পরিশ্রম করছে এই বাঙালি ছেলে, বিট্টু। না, আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াই নি। যা কিনতে গিয়েছিলাম সেসব না কিনেই এগিয়েছি অন্য দোকানে।

আজ এই প্রশ্নটা উঠে আসা খুবই প্রয়োজন যে, বাঙালিরা কি অথবা কেন ব্যাবসায় বিমুখ? বাঙালিদের ব্যাবসা প্রসঙ্গে, কবিগুরুর সমসাময়িক ১৮৬১ সালে জন্মেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাঙালিদের বুঝতে একটুও ভুল করেননি। তাই হয়তো " অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা " প্রবন্ধ সমেত নিজের অনেক লেখাতেই সেই সুর স্পষ্ট শোনা গেছে। উনি লিখেছেন-
"আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন" দেখে, "বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া" জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দেয়। ফলে "বাঙালি সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপদ হইতেছে। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা ব্যবসাবাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র করতলগত করিতেছে, আর আমরা বাঙালিরা তাদের হিসাব লিখিয়া মাসমাহিনা লইয়া পরমানন্দে কলম পিষিতেছি। বাঙালি শ্রমজীবির দশাও কিছু ভাল নহে।" হিন্দু কেমিস্ট্রির লেখক, বাঙালিদের উদ্দ্যেশ্যে লিখেছেন- "আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। শুধু আলস্যের আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতেছি। আজ বাঙালির পরাজয় পদে পদে।"

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০ বছর আগে যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তেমনই উনি লিখে গেছেন। তবে ওনার বক্তব্য নিয়ে সামান্য হলেও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।
প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালিদের বলেছেন অলস, কুঁড়ে কথাটা কিছুটা ঠিক আবার খানিকটা ভুলও। মাছেভাতে বাঙালিদের একটা বড় অংশ কিন্তু সত্যিই ব্যাবসা বিমুখ। তারা সরকারি (অথবা বে-সরকারি) চাকরিজীবী হয়েই বেঁচে থাকায় অপরিসীম আনন্দ পায়। একটা উদাহরণ দিই। সেটা ২০০৩ সালের ঘটনা। আমার পরিচিত একজন দিদির শ্বশুরের দোকান ছিল আসানসোল বাজারে একেবারে রাস্তার ওপর। দিদির জীবনসঙ্গীর একবার বেশকিছু টাকার প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক লোনের জন্য ঘুরেঘুরে নাজেহাল হয়ে শেষে দোতলা দোকানটাই বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। আমার বাবা সেই জামাইবাবুকে অনেক বুঝিয়েছিল, দোকান বিক্রি না করে গোডাউন হিসবে ভাড়া দিতে (দোকানটি ছিল শাড়ি, অন্তর্বাসের। ব্যাবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তো পুঁজি প্রয়োজন। আবার পুঁজি থাকলেও যে ব্যাবসা দারুন ভাবে এগিয়ে যাবে এটাও ভুল। লাভ-ক্ষতি নিয়েই ব্যাবসা। তাছাড়া জামাইবাবুদের দোকান সেভাবে চলছিলও না)। কিন্তু একদিন চুপিচুপি সেই দোকানটি একজন হিন্দিভাষী ব্যক্তির কাছে ২২ লক্ষ টাকাতে বিক্রি হয়ে গেলো। প্রিয় পাঠকবন্ধুরা, এখন একটিবার ভাবুন, ২০০৩ সালে যেটা ২২ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল আজ ২০২২ সালে সেই দোকানের দাম কতটা বৃদ্ধি পেতো? দোকানটি বিক্রি করে সেইটাকা জামাইবাবু কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন জানা নেই, তবে বর্তমানে উনি একটি বে-সরকারি সংস্থার অফিসে সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ০৬টা পর্যন্ত কাজ করেন ১২ হাজার টাকা মাসিক বেতনে। এইকারনেই কি প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন- “আমরা দোকান করিয়া ফেল মারি। কারণ সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস আমাদের যুবক গণের মধ্যে দেখা যায় না।”

"বাঙালি ব্যাবসায় বিমুখ অথবা বাঙালিদের দ্বারা ব্যবসা হবে না" কথাগুলো আমি অন্তত মানিনা। আসলে এগুলো একপ্রকার অপপ্রচার এবং খুব সুকৌশলে আমাদের মননে ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ চালানো হয়েছে এবং হচ্ছেও। একসময় কলকাতা শহরজুড়ে বাঙালিদের দোকান ছিল চোখে পরার মতন। তাদের ব্যবসাও ছিল রমরমা। কিন্তু আজ সেসব অতীত। এখন পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারি, গুজরাটি কিংবা বিহার, উত্তরপ্রদশ থেকে আগত 'বেওসায়ীরা' তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করে ফুলেফেঁপে উঠলেও বাঙালিরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আটকে রয়েছে। বাঙালিদের একটা বড় অংশের আজ নিজের মাতৃভাষার বদলে হিন্দিপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান কোনো রাষ্ট্রভাষা না থাকলেও খুব কৌশলে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বানানোর কাজ চলছে, চলবেও। দুঃখের বিষয় বাঙালিরাও এটা একপ্রকার প্রচার চালাচ্ছেন। আজ উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবার তাদের সন্তানদের নামীদামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তী করিয়ে অত্যাধুনিক বানানোর একটা প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাচ্ছে কারন " আমার সন্তানের বাংলাটা ঠিক আসেনা " জাতীয় কু-যুক্তিও শোনানো হচ্ছে।

আরেকটি গুরুতর বিষয় হচ্ছে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তরুণতুর্কী বাঙালি ছেলেমেয়েরা যখন হাতে অস্ত্র তুলে লড়াইয়ের ময়দানে, তখন কিছু বেইমান বাঙালি ব্রিটিশদের তাঁবেদারি করতে ভীষণ ব্যাস্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসেব বলা যায়, মাস্টারদা সূর্যসেনের মাথার দাম যখন ব্রিটিশেরা ১০০০ টাকা ধার্য করে তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ব্রিটিশদের দেওয়া ৬০ টাকার চাকরি করতেন এবং মাস্টারদা কে ধরিয়ে দিতে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যখন অসংখ্য তরুণ প্রাণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অকালে ঝড়ে যাচ্ছিল তখন একদল বেনিয়ারা ব্রিটিশদের পদলেহন করে সুদের টাকা গুনে মুনাফা কামানোর দিকে বেশি নজর ছিল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে অসহায় জনগণ যখন সামান্য ভাতের ফ্যানের জন্য হাহাকার করছে তখনও এই বেনিয়াদের দল অগুনতি লাশের ওপর দাঁড়িয়ে চালের কালোবাজারি করেছে এবং বলে গেছে 'বাঙালি লোগো সে বেওসা নেহি হোগা। উ লোগ মাছলিভাত খাকে গেহেরি নিন্দ মে যানে ওয়ালা বড়াহি আলসি কিসম কা জাতি হায়'।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। কিন্তু বাঙালিদের সুদিন কি সত্যিই ফিরেছে? ফিরলে আজ সেই বিট্টু অন্যের দোকানে ৪৫০০ টাকা রোজগারের জন্য এতো পরিশ্রম না করে হয়তো নিজস্ব দোকানে কোনো ব্যবসা করতো, নিদেনপক্ষে মুদিখানা।

কয়েকমাস আগে বন্ধু সুপ্রিয়র সাথে হাওড়া গিয়েছিলাম দিল্লিগামী ট্রেন ধরবো বলে। হাওড়া ব্রিজের (রবীন্দ্রসেতু) ওপর দাঁড়িয়ে বন্ধুটি বলছিল - "ব্রিটিশদের আমরা যতই গাল পারি তাদের উগ্রতা ও ফ্যাসিস্ট আচরণের জন্য, কিন্তু এটা মানতেই হবে তারা

নিজেদের প্রয়োজনে দেশটাকে খোলনলচে বদলেছিল অনেকটাই। এই যেমন হাওড়া ব্রিজের কথাই ধরা যাক। অসংখ্যা গাড়ি যানবাহনের ভার নিয়েও ব্রিজটা আজও কেমন সুন্দর ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ বর্তমানে কোনো ব্রিজের টেন্ডার ডাকা হলে সেটা অন্যরাজ্যের লোকেরা এসে বানাচ্ছে। এই বানানোতেও কোটিকোটি টাকার দুর্নীতি আর ব্রিজটাও তেমন টেকসই হয়না।উদাহরণ, বিবেকানন্দ সেতু।"

বন্ধু সুপ্রিয়র কথাগুলো খুব ভুল নয়। আজ দুর্নীতি সর্বগ্রাসী। এই রাজ্যের শ্রমিকেরা নিজেদের সংসারে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয় অথচ অন্যে রাজ্যের শ্রমিকেরা এখানে সুন্দর ভাবে কাজ করে অন্নসংস্থান করছে (মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের অনেক হিন্দু বাঙালি বা বাঙালি মুসলিমরা কাজের জন্যে ভীন রাজ্যে যায় না এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না)। আজ কলকাতার বড়বাজার থেকে হাওড়া, ডানকুনি, রানিগঞ্জ, আসানসোল প্রায় সর্বত্র মাড়োয়ারি, গুজরাটি দের রমরমা ব্যাবসা এবং সেখান থেকে কোটিকোটি আয়।

দিনেরশেষে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়ায় যে, বাঙালিরা কি পারবে সেই হারানো দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে? অলস, কুঁড়ে ইত্যাদির তকমা পাওয়া মাছেভাতে বাঙালিরা কি পারবে ব্যাবসায়ী রুপে প্রতিষ্ঠিত হতে? মাড়োয়ারি, গুজরাটিরা যেভাবে এই রাজ্যে শেকড়গেঁড়ে বসে কোটিকোটি টাকা ব্যাঙ্কে ভরছে, ঠিক তেমন কিছু কি বাঙালিরাও পারবে?

লেখাটি শেষ করবো দেশের ডাক বইএ তরুণের স্বপ্ন প্রবন্ধে (পৃ. ৬-১০) সুভাষচন্দ্র বসুর একটি দারুন উক্তি দিয়ে যা উনি ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন। " অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকাল বাঙ্গালীই থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ”। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ।"

দেহদান মানবতার এক অঙ্গীকার

-পৃথ্বীশ ঘোষ

দেহদান ও চক্ষু দান এর কথা মনে পড়তেই প্রথম যে বাধার সম্মুখীন হই আমরা তা হল আজন্ম লালিত কিছু ধর্মীয় কুসংস্কার। যদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করি পুনর্জন্ম (rebirth) হলে সেই অঙ্গ ছাড়াই প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে। তাছাড়া ধর্মীয় বাধা সামাজিক বাধা এগুলো এক এক করে আসে। যদি এসব বাধা কাটিয়ে কেউ ইচ্ছে করলেই অনায়াসে এই মহৎ দানে ব্রতী হতে পারে। মরণোত্তর দেহদান হল মৃত্যুর পর শবদেহ ধর্মীয় প্রথাসিদ্ধ মতে সৎকার না করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা। যাঁর মৃতদেহ তিনি কিন্তু নিজে এই দান করতে পারে না, সেটাই স্বাভাবিক। কারন মৃত্যুর পর তিনি দান করবেন কি করে? কোন ব্যক্তি জীবিতকালে শুধুমাত্র তাঁর এই ইচ্ছার কথা অঙ্গীকারের মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে পারেন শুধু। তাঁর ইচ্ছাপূরণের দায়টা কিন্তু নিকটজনের। আর এই ইচ্ছাপুরণটা যাতে হয় সেক্ষত্রে অঙ্গীকারকের একটা ভূমিকা আছে। তা হল এই অঙ্গীকারের বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যা দিয়ে সে নিকটজনকে মোটিভেটেড করতে পারবে।

আমি 2010 সালেই গণদর্পন এর মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করেছিলাম। আপনার প্রিয়জন যার ইতিমধ্যেই ব্রেন ডেথ হয়েছে তার সুস্থ সবল অঙ্গ দিয়ে অন্য আর একজন ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। বলতে গেলে তিনি অন্য একজনের মধ্যেই স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবেন। আপনার প্রিয়জনের দুটি চোখ দুজন অন্ধ মানুষ কে পৃথিবীর আলো দেখাতে পারে । তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণায় নানাবিধ সাহায্য হয়ে থাকে। যদি ইতিহাসের পাতায় ফিরে যাই পৃথিবীর প্রথম মরণোত্তর দেহদান হয় 1832 সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ জেরমে বেন্থাম এর। ভারতে 1956 সালে পুনের শিক্ষাবিদ পান্ডুরঙ শ্রীধর আপ্তে। পশ্চিমবঙ্গে 1990 সালের 18 ই জানুয়ারি সুকুমার হোমচৌধুরী। পূর্ব অঙ্গীকার মতো সুকুমার হোমচৌধুরীর মরদেহ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

1905 সালের 7 ডিসেম্বর প্রত্যঙ্গদানে ঘটে যুগান্তকারী ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে চেকশ্লোভাকিয়ায় চক্ষু চিকিৎসক এডোয়ার্ড কনরাড জার্ম (Eduard conarad Zirm) হাত ধরে। 45 বছরের অ্যালোস গ্লোগা (Alois Gloga) কর্ণিয়াজনিত কারণে দুটি চোখেই দৃষ্টিহীন। তখন এডোয়ার্ড কনরাড জার্ম 11 বছরের কার্ল ব্রুয়ের (Karl Brauer) একটি চোখের কর্ণিয়া নিয়ে অ্যালোস গ্লোগার চোখে প্রতিস্থাপন করেন। হ্যাঁ, এই কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন ছিল জীবিত মানুষের থেকে নিয়ে। আর এই ছিল একমাত্র প্রথম ও শেষ জীবিত কারো থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে কর্ণিয়াজনিত কারনে কোন ব্যাক্তিকে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন। দক্ষিণ ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আব্রাহাম কোভুর ও আক্কা কোভুর। তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের মরদেহও চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘটনাটি ঘটে 1970 সালে। 1987 সালে শ্রীলঙ্কায় এল টি টি ই-র নেতা দিলীপ থেলাপ্পান অনশন চলাকালীন মারা যান। উনার অঙ্গীকার অনুযায়ী উনার মৃতদেহ জাফনা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

কোভিড মহামারীর মধ্যেই গনদর্পন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দেহদান আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্রজ রায়ের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর (13,may,2021) পর প্যাথলজিক্যাল অটোপসি করা হয়। এই প্রথম পূর্ব ভারতে কোনও কোভিডে মৃত ব্যক্তির প্যাথোলজিক্যাল অটোপসি হয় বলে আরজি কর হাসপাতাল সূত্রে দাবি। মৃত্যুর সঠিক কারণ কী, কোভিডের কারণে মৃতের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, প্যাথলজিক্যাল অটোপসির মাধ্যমে তা জানা সম্ভব।

1994 সালে ভারত সরকার 'দ্য ট্রান্সপ্লানটেশন অব হিউম্যান অরগ্যান অ্যাক্ট – 1994' আইন চালু করেন। এই আইনের ফলেই সাধারণ মৃত্যুর পাশাপাশি মস্তিষ্কের মৃত্যুও স্বীকৃতি পায়। এরফলে যান্ত্রিকভাবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু রেখে মৃতের দেহ থেকে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে রাস্তা সুগম হয়। 1995 সালে আমাদের রাজ্য এই আইন গ্রহণ করে। কিন্তু 2010 সাল পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে শুধুমাত্র কর্ণিয়া ছাড়া মৃতদেহ থেকে অন্যকোন অরগ্যান সংগ্রহ ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় নি। ২০১০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী এস এস কে এম হাসপাতালে জয়দেব পালের মৃতদেহ থেকে লিভার সংগ্রহ করে সিরোসিস অব লিভারে আক্রান্ত জয়তী চট্টোপাধ্যায়ের দেহ প্রতিস্থাপিত হয়। নদীয়ার দীনেশচন্দ্র মোদক হঠাৎই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যান। তখন উনার একমাত্র কন্যা বন্দনা মোদকও বিকল দুটি কিডনী নিয়ে মৃত্যুর দিনের অপেক্ষায়। তখন চিকিৎসারত চিকিৎসক ডাঃ এম সি শীল মৃত দীনেশচন্দ মোদকের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে জানান যে উনার স্বামীকে ফিরে পাবেন না কিন্তু আপনি আপনার মেয়েকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেন যদি দীনেশবাবুর মৃতদেহ থেকে কিডনী বন্দনার দেহে প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেন। লক্ষ্মীদেবী অনুমতি দেন। বন্দনা আজো বেঁচে আছে আমার আপনার মতই।

সাধারণ মৃত্যুর পর যেসব অরগ্যান নেওয়া সম্ভব

১) চোখ (গ্লুকোমা, ক্যানসার, হেপাটাইটিস, এইচ আই ভি বা সেপটোসেমিয়া থাকলে সম্ভব নয়) (একমাত্র কর্ণিয়া জনিত কারনেই দৃষ্টিহীন হলেই তাকে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব) (যদি কেউ কর্ণিয়াজনিত কারণ ছাড়া অন্যকারনে দৃষ্টিহীন হয় তবে সেই দৃষ্টিহীন ব্যাক্তিও চোখ দান করতে পারেন)। আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী ৪ ঘন্টার মধ্যে।
২) ৪ ঘন্টার মধ্যে অস্থি, ত্বক, ইয়ারড্রাম ও ইয়ার বোন।
৩) ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে কিডনী।

কিছু অরগ্যান যা রক্ত সঞ্চালন অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়।

সেগুলো হচ্ছে ১) কিডনী, ২) হার্ট ও হার্ট ভালভ, ৩) প্যাঙক্রিয়াস, ৪) অস্থিমজ্জা, ৫) রক্ত ও অনান্য সব।

এবার চক্ষুদান নিয়ে কিছু কথা বলি আপনার চোখে দৃষ্টি পাবে দৃষ্টিহীন কেউ। এই মহত কাজটি অনেকেই মৃত্যুর আগে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু অনেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিস্তর ভাবনাচিন্তা করে। কিন্তু ওই যে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আর হয়ে ওঠেনা।
উল্লেখ্য, আমাদের দেশে চোখ দানের
প্রয়জনীয়তা রয়েছে। তবে পাশাপাশি, আসল প্রক্রিয়া, উপকারিতা, কল্পনা, মিথ এবং ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভুলধারণা রয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ভারতে আনুমানিক ১৫ মিলিয়ন মানুষ দৃষ্টিহীন এবং ৩০ মিলিয়ন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লড়ে চলেছে। ডাক্তার হর্ষবর্ধন ঘোড়পাদে বলেছেন ভারতে চোখের দান সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার হয়না। কারণ এর চারপাশে বহু মিথ ও কুসংস্কার রয়েছে; চোখ দান সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করা উচিত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব গুলি । সেই সঙ্গে আমরা যতটা রক্তদানে আগ্রহী তার সিকিভাগ যদি এই ব্যাপারে উৎসাহী হই তাহলে সমাজের পক্ষেই মঙ্গল হবে । এখন তো বিভিন্ন ক্লাব তাদের রক্তদান কর্মসূচির মধ্যেই দেহদান ও চক্ষুদান কে অন্তর্ভুক্ত করছে আমি বলাগড়ে ব্লকে দেখেছি ।

●চোখ দানের পিছনে যে ভুল ধারণা রয়েছে দেশেজুড়ে তা হল -
◆চোখের দান করলে পরের জন্মে চোখ হবে না। মুখের আদল নষ্ট হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরও যে জন্ম হয়, তার নিশ্চিত পরীক্ষামূলক তথ্য নেই। তাছাড়া বিভিন্ন কারনে অনেক সময় জীনগত কারনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।
◆সঠিক তথ্য- চক্ষু দান করলে মুখের চেহারা নষ্ট হয় না। কর্নিয়া নেওয়া হয়। যখন চোখ বন্ধ থাকে , তখন স্বাভাবিকই থাকবে।
●কোনও ব্যক্তি জীবিত থাকাকালীন তাদের চোখ দান করতে পারে।
◆সঠিক তথ্য: না। কিডনি বা যকৃতের কিছু অংশ জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তিকে দান করা যেতে পারে, তবে মৃত্যুর পরে চোখ দান করা হয়। আপনি জীবিত থাকাকালীন আপনার চোখ দান করার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে অঙ্গীকার করতে পারেন।
● চক্ষু দান সমস্ত অন্ধ মানুষকে সাহায্য করতে পারে।
◆সঠিক তথ্য: শুধুমাত্র কর্নিয়ার অস্বচ্ছ ব্যক্তিরাই উপকৃত হতে পারে, অন্যদিকে রেটিনা বা অপটিক নার্ভের জন্য অন্ধত্ব এলে তারা চোখ দান থেকে উপকৃত হবে না।
● আপনি যদি রেটিনার রোগে ভোগেন বা আপনার চোখে শল্যচিকিৎসা হয়ে থাকে, আপনি দাতা হতে পারবেন না।
◆সঠিক তথ্য: রেটিনা বা অপটিক নার্ভ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের পর চোখ দান করা যায়।
● চোখ মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় দান করা যায়।

◆সঠিক তথ্য: মৃত্যুর ৬ ঘন্টার মধ্যে কোনও দাতার কাছ থেকে চোখ সংগ্রহ করা দরকার। দাতার দেহকে শীতল পরিবেশে রাখা উচিত। চোখ বন্ধ করা, আর্দ্র সুতির কাপড় চোখের উপরে রাখা এবং মাথার নীচে দুটি বালিশ রাখতে হবে। কারণ, স্থানীয় চক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (হাসপাতাল) বা চক্ষু ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সময় প্রয়োজন। আর সেই সময় যাতে চোখ ঠিক থাকে তার জন্যই এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

●চোখ দান করে বিক্রি করা হয়।

◆সঠিক তথ্য: যে কোনও মানব অঙ্গ বিক্রি ও ক্রয় করা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এটি একটি মহৎ কাজ এবং অনুমোদিত সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শেষ করব বাংলাদেশের মুক্তমনা আরজ আলী মাতুব্বর দেহদান সম্পর্কে কি লিখেছেন আসুন জেনে নিই -

আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০–১৯৮৫)

আমাদের মত শিক্ষিত বলে কথিত সুশীলদের গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিয়েছেন আরজ আলী মাতুব্বর। শুধু জীবিত অবস্থায় নিজেকে আর অন্যদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেননি, তিনি তার মৃত্যুর সময়েও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যে সাহস এর আগে কোন শিক্ষিত সুশীলেরা করে দেখাতে পারেনি। পাঠক মনে রাখবেন বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপট ও তৎকালীন সময়ে মৌলবাদীদের অত্যাচার ।

তিনি তার মৃতদেহ কবরে দাফন না করে মানব কল্যাণে দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা 'কেন আমার মৃতদেহ মেডিকেলে দান করেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন –

'...আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানব কল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগন শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিকেলে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানব-কল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা।'

মাতুব্বরের মৃতদেহ দানপত্রটি হুবহু তুলে দিলাম – যা এখনো আমাদের মতো মানবতাবাদীদের জন্য অফুরন্ত প্রেরণার উৎস –

অধ্যাপক আহমদ শরীফ (1921 - 1999)

মাতুব্বরের মতো বাংলার বিবেক, অধ্যাপক আহমদ শরীফও তার মৃতদেহকে মেডিকেল মানব কল্যাণে দান করে গেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের মৃতদেহ দানপত্রের মতো আহমদ শরীফের সম্পাদিত (মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর আগে) তার 'অছিয়তনামা' আর 'মরদেহ হস্তান্তরের দলিল' দুটিও বাংলা আর বাঙালির মুক্তবুদ্ধির ইতিহাসে অনন্য কীর্তি।

অছিয়তনামায় তিনি লিখেছিলেন –

"আমি সুস্থ শারীরিক এবং সুস্থ মানসিক অবস্থায় আমার দৃঢ় সঙ্কল্প বা অঙ্গীকার স্থির সিদ্ধান্ত-রূপে এখানে পরিব্যক্ত করছি।

আমার মৃত্যুর পরে আমার মৃতদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্য ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বেসরকারী মেডিকেল কলেজে অর্পণ করতে চাই। ... চক্ষুদান এবং রক্তদান তো চালুই হয়েছে। চোখ শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ-প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরের কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই তো বাঞ্ছনীয়।"

জ্যোতি বসু (১৯১৪ – ২০১০)

২০১০ সালের ১০ই জানুয়ারি কলকাতার সল্ট লেকের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার পর কিছু সময় পরেই তাঁর চোখের কর্নিয়া অপসারণ করেন চিকিৎসকরা, তারপর তার দেহ ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জ্যোতি বসু জীবিত অবস্থাতেই বলে গিয়েছিলেন এভাবে –

"জানিনা আমার অশক্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কারো কাজে আসবে কিনা! কিন্তু আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আমার মরদেহ যেন অন্তত গবেষণার কাজে লাগানো হয়।একজন কমিউনিস্ট হিসেবে জানতাম জীবিতকালে মানুষের সেবা করতে পারব। মৃত্যুর পরেও যে মানবতার কাজে লাগা যাবে, এটা জেনে প্রফুল্ল বোধ করছি।"

প্রথমেই জানাই আপনি যদি মরণোত্তর দেহদান ও প্রত্যঙ্গদানের জন্য অঙ্গীকার করতে চান তবে যোগাযোগ করতে পারেন।

1- গণদর্পণ
৪, ডি এল খান রোড, কর্পোরেশন বিল্ডিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৫
দূরভাষ – (০৩৩) ২৪৫৪ ০৮৯১ / ২৪১৯ ১১৬৫
http://www.ganadarpanindia.in/index.php
ওয়েবসাইট এ গিয়ে প্লেজ ফর্ম পাবেন ডাউনলোড করে নিন পছন্দ মত ভাষায়। ফিলাপ করে ওদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে ওরাই আপনাকে একটি কার্ড পাঠিয়ে দেবে। গণদর্পণ কোন চক্ষু বা মৃতদেহ সংগ্রহ করে না। একমাত্র প্রত্যঙ্গদানের ক্ষেত্রে সহয়তা করে।
চাইলে অনলাইনের মাধ্যমেও এই কাজটা করতে পারেন। https://www.notto.gov.in
2- বাংলাদেশে যারা মরণোত্তর দেহদানে আগ্রহীঃ
জনবিজ্ঞান ফাউন্ডেশন
১০৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
বাংলামটর, ঢাকা
ফোন: ০১৫৫২৩৫৮০১৮
ইমেইল:
janabigganfoundation@gmail.com
ayubhoss@yahoo.com
3- Department of Anatomy, N.R.S. Medical College, 138, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 014 Phone No. (033) 2265-3214 (EXTN.- 383)।
কলকাতার এন.আর.এস মেডিক্যাল কলেজ-এর Department of Anatomy থেকেও এই Pledge Formটি (একই ফর্মের দুটি কপি) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন।

4- চক্ষু দান এর জন্য
RIO Calcutta Medical College & Hospital Eye Bank.
9433085756 / 9007064831 / 033-22123767 / 033-22413853

5- বর্ধমান
Durgapur Blind Relief Society
C/o: SDO Office
City centre, Pin – 713 216
(0343) 2572698 / 9732066165

6- জলপাইগুড়ি
Alipurduar Lions Eye Hospital
Chowpathi. P.O – Alipurduar Dist- Jalpaiguri Pin – 736 121
(03224) 255938

7- হুগলি
Doyen Dishani
37, Hanseswari Road, Banshberia, Hooghly, Pin – (033) 26344555 / 26527555 / 9433084563 / 9433052503

8- দার্জিলিং
Siliguri Lions Eye Bank
Hillcart Road, P.O – Shiliguri, Dist – Darjeeling
2511004 / 2519793

কলকাতা থেকে দূরে যাঁরা থাকেন তাঁদের অনুরোধ করব মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আপনাদের নিকটবর্তী সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

সূত্র-
1-সংশয় ডট কম/ মৃত্যুই শেষ কথা নয় ।
2- ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ফেসবুক পেজ ।
3- 13/05/2021 এর আনন্দবাজার পত্রিকা ।
4- মুক্তমনা ব্লগ।

কন্যাসন্তান- চিন্তার উদ্রেক!

-সুপ্রিয় রায়

একমুখ হাসি হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনারা খুব সৌভাগ্যবান! আপনাদের একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান হয়েছে।' কিন্তু ডাক্তারবাবু কি রসিকতা করছেন? প্রথমবারে কন্যাসন্তান হওয়ার পর যখন দ্বিতীয়বারেও কন্যাসন্তানের জন্ম হয় সেটা কী করে সৌভাগ্য হতে পারে? আর কন্যাসন্তান আবার 'ফুটফুটে' কী? –এইসব ভাবনারা তখন সদ্যজাত শিশুটির বাবা-দাদু-ঠাকুমাসহ পরিবারবর্গের কপালে বেশ গভীর ভাঁজ সৃষ্টি করেছে।
কতো ইচ্ছা ছিল পুত্রসন্তান তথা নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে বাবা ও দাদু-ঠাকুমা বলবেন 'একেবারে সোনার চাঁদ হয়েছে গো!' সেসব কিছুই হলো না, পাড়ার লোককে পেটপুরে মিষ্টি খাওয়ানোর যে প্রবল ইচ্ছা ছিল, তাকেও ওই 'ফুটফুটে' মেয়েটির জন্য জলাঞ্জলি দিতে হলো। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসায় গলা থেকে বেরিয়ে আসে মর্ম নিংড়ানো গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত স্বর- 'মেয়ে হয়েছে!' প্রতীবেশীরাও সান্ত্বনা দেওয়ার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করে না–'ছেলে হলো না! বুড়ো বয়সে কে যে ভাত দেবে! ছোটোটা-কেই না হয় ঘরজামাই করে রেখে দেবে। তবে চিন্তা করো না, এখন থেকেই কিছু কিছু জিনিসপত্র গড়িয়ে রাখলে ভালো ঘরেই পড়বে। আর যিনি মেয়ে করে পাঠিয়েছেন, তিনিই ঠিক একে একে পার করে দেবেন।'

নীল দিন পালন করা বর্জন করুন

-রাজর্ষি

সম্প্রতি কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে "বিশ্ব অটিজম সতর্কতা দিবস" পালন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নীল বাতি জ্বালাচ্ছেন, রিবন ব্যাজ পরছেন, পাজল চিহ্ন পোস্ট করছেন। কিন্তু জানেন কি, এই অনুষ্ঠান কোন বার্তা দেয়?

আমি নিজে অটিস্টিক । অনেকের ধারণা অটিস্টিক ব্যাক্তি মাত্রই কথা বলতে লিখতে বা পড়তে অক্ষম, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি ঐ তিনটি কাজই আমি যথেষ্ট ভালভাবে করতে পারি। আমার নিজের বক্তব্য আমি তুলে ধরতে পারি, আর যেসমস্ত অটিস্টিক ব্যাক্তি এই তিন মাধ্যমে সংযোগ করতে পারেন না, তাঁদের প্রকৃত অনুভূতি ঠিক কিরকম, সেটা বলার মতো কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি রাখি; যেটা "পেশাদার" বিশেষজ্ঞরাও বুঝতে পারেন না।

অটিজম বিষয়ে লাগাতার প্রচারাভিযানের ফলে আজকাল অটিজম শব্দটি সবাই জানেন। অথচ অটিজম কী, সে বিষয়ে প্রায় কেউই ঠিকঠাক জানেন না । অটিজম কথার আক্ষরিক অর্থ 'আত্মমগ্নতা', ডাক্তারি পরিভাষায় কোনো বিশেষ আকর্ষণের প্রতি প্রবল একাগ্রতা এবং একই কাজ বারবার করে যাওয়া, সামাজিক বোধ এর অভাব।

এখন, ভাবার বিষয় হল, 'আত্মমগ্নতা' কে আদৌ 'ব্যাধি' বলা উচিত কিনা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তিক্ত সত্য এই, যে, যেসমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মমগ্নতা কে 'ব্যাধি' হিসেবে চিহ্নিত করেন, তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন সরাসরি নাৎসি গণহত্যাকারী সুপ্রজননবাদী। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের, অর্থাৎ যাদের "educability" কম থাকতো, যাদের 'ডিসিপ্লিনড' করা যেতনা, তাদের হত্যা করা হত। ফলে 'আত্মমগ্নতা' যাকে এখন ব্যাধি বলে গণ্য করা হয়, সেটি কতটুকু ব্যাধি, আর কতটুকু সমাজযন্ত্রের শিকার, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এখন, কথা উঠতে পারে, যে অটিস্টিক ব্যাক্তি কি সমস্যার সম্মুখীন হন না? অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হন, এবং তথাকথিত 'স্বাভাবিক' মানুষের চাইতে অনেক, অনেক, অনেক বেশি। কিন্তু একটু ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্যই দেখা যায় 'আত্মমগ্নতা' সমস্যাগুলির কারণ নয় বরং সমাজই সমস্যাগুলির উৎস। ধরুন, কোনো ব্যাক্তি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। তাহলে তাঁর কর্মস্থলের সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তাঁর 'পিছনে লাগবেন', তাঁর 'ঘণ্টি বাজিয়ে' দিয়ে চলে যাবেন। যেন অটিস্টিক ব্যাক্তি টি কোনও গুরুতর অপরাধ করেছেন। ডাক্তারবাবুরা হয়ত জ্ঞান দেবেন, আরও চেষ্টা করুন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার। প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টায় হারায় আত্মবিশ্বাস। কিন্তু আমরা কেউ কি কখনও ভেবে দেখেছি, প্রকৃত বক্তব্য পেশ করার সাথে চোখের দিকে তাকানোর আদৌ কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? শুধুমাত্র এরকম অগুনতি ছোটো-ছোটো সামাজিক নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে ফেলায় মানুষকে প্রতিনিয়ত অবিশ্বাস আর হয়রানি র শিকার হওয়া টা একরকম অবধারিত। এবার আসি, তাঁদের কথায়, যাঁরা কথা বলার মাধ্যমে সংযোগ রাখতে পারেন না। বাড়িতে হাহাকার পড়ে যায় কথা বলা শেখানোর জন্য। শেষমেশ আমরা ভেবে নিই বাচ্চাটির কোনও বোধ-বুদ্ধি নেই । অথচ আমরা কেউই হয়ত জানি না, যে, চিন্তাভাবনা করার জন্য শব্দ বা বাক্যই একমাত্র ভাষা নয়। ছবির ভাষা, অলটারনেটিভ অগমেন্টেটিভ কমিউনিকেশন, সাইন ল্যাংগুয়েজ, ব্রেইল, আরো বহুরূপ ভাষা আছে পৃথিবীতে। অনেকেই আছেন যাঁরা কথা বলতে পারেন না, কিন্তু টাইপ করতে পারেন এমনকি বাইরের দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। (সন্দেহ থাকলে গুগল করুন হরি শ্রীনিবাসন সম্পর্কে, যিনি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই।) তাহলে সমাজ যদি ভেবে নেয় কথা বলার ভাষা ই একমাত্র ভাষা, আর যারা যারা সেই ভাষায় কথা বলতে পারবেনা, তাদের কিছু বক্তব্য থাকতে পারেনা, তাহলে সমস্যাটা আত্মনিমগ্ন ব্যক্তির নয়। সমস্যাটা সমাজের।

“তোমার অটিজম কে তুমি পরাস্ত করেছ” – সমাজের এই অদ্ভুত কথাবার্তা আমাদের অনুপ্রাণিত করেনা। তার কারণ অটিস্টিক ব্যক্তি এবং অটিজম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। চঞ্চলতা চঞ্চল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, শান্তভাব শান্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, চামড়ার কালো রঙ কালো মানুষের বৈশিষ্ট্য, গাণিতিক চিন্তা গণিতবিদের বৈশিষ্ট্য। ঠিক সেরকম ‘অটিজম’ অটিস্টিক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যও। অটিজম কে অস্বীকার করতে বলা মানে অটিস্টিক ব্যক্তির নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, সমাজটা তথাকথিত সামাজিক লোকজন নিয়ে তৈরী। (অটিস্টিক রা সংখ্যালঘু এবং বিচ্ছিন্নও) ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশ, এমনকি বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, এমনকি প্রায়শই অটিস্টিক ব্যক্তির তথাকথিত ‘স্বাভাবিক’ বাবা-মা ও ঠাহর করতে পারেন না, সমস্যাটা আদতে ‘অটিজম’ নয়। কিন্তু যাবতীয় বইপত্র, ‘চিকিৎসা পদ্ধতি’ (?), সতর্কতা অভিযান তৈরি হয়েছে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, যাদের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। ফলে তাঁরা তৈরি করে ফেলেছেন অটিজম এর “মেডিক্যাল মডেল”, যেখানে অটিজম কেই মূল সমস্যা বলে মনে করা হয়। আর আগেই বলেছি, অটিজম কে অস্বীকার করা আর অটিস্টিক ব্যক্তি কে অস্বীকার করা একই ব্যাপার। কদর্য এবিএ চিকিৎসাপদ্ধতির প্রবর্তক ইভার লোভাস মনে করতেন অটিস্টিক ব্যক্তিরা মানুষের মধ্যে গণ্য নয়। আজও, ব্যায়বহুল এইসব কদর্য চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে আচরণের অবদমন শেখানো হয়। যার ফলে আপাতদৃষ্টিতে অটিস্টিক ব্যক্তিকে ‘স্বাভাবিক’ মনে হয়। কিন্তু পরিবর্তে সে হারিয়ে ফেলে তার নিজের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। ভুলে যায় তার নিজের ও কিছু বলার থাকতে পারে, যেটা হয়ত বাকি পৃথিবীর সাথে মিলবে না। এই পণ্ডশ্রম অটিস্টিক ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে নিজের মতো করে খেলা থেকে, নিজের মতো করে বাঁচতে শেখা থেকে।

নীল দিন কেন নয়?

কোটিপতি ব্যবসায়ী সংগঠন “অটিজম স্পিকস” মনে করে অটিজম কোনও ঘৃণ্য অভিশাপ। এরা অটিজম সম্পর্কে মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এরা বারংবার এইডস ক্যান্সার প্রভৃতি মারণব্যাধির সাথে আত্মমগ্নতা কে এক শ্রেণিতে ফেলাটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত করে তোলে । । ২০০৯ সালে “আই অ্যাম অটিজম” বিজ্ঞাপন এ এরা মানুষজন কে প্রবল ভাবে ভয়ার্ত করে তুলেছিল। প্রচার করছিল অটিজম বাবা-মা র embarassment (লজ্জা) র কারণ। প্রকৃতপক্ষে সমাজই লজ্জার কারণ। প্রভাবশালী এই সংস্থা গোটা পৃথিবী থেকে কোটি-কোটি টাকা ডোনেশান তোলে, যার সিংহভাগ যায় অটিজম কে পৃথিবী থেকে তাড়ানোর গবেষণায়, (অটিজম দূর করা আর অটিস্টিক ব্যাক্তি কে দূর করা একই ব্যাপার আগেই বলেছি)। অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন সহজসাধ্য করে তোলার কোনো কাজে তাৎপর্যপূর্ণ কোনমাত্র অংশ নেয় না সংস্থাটি। সংস্থাটিতে ক্ষমতাসীন পদে কোন অটিস্টিক ব্যাক্তি নেই।

এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক মহল কে সহজেই প্রভাবিত করে। আমেরিকার সরকার ও ‘ওয়ার অন অটিজম’ (আত্মমগ্নতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ) অভিযান করছিলো। এবং এপ্রিল ফুলস ডে- র পরদিন অর্থাৎ ২রা এপ্রিল কে নীল দিন অর্থাৎ বিষণ্ন দিন ঘোষণা করা হয়।

অটিজম মোটেও হুহু করে বাড়ছেনা। প্রাচীন কালের মুনি ঋষি দার্শনিক দের কথা পড়লে তাঁদেরকে অটিস্টিক বলেই মনে হয়। আমাদের সমাজে অটিস্টিক মানুষ আরও অনেক বেশি বেশি দরকার। যারা সমাজের সংখ্যাগুরুর ভুল গুলিকে ধরিয়ে দিতে সমর্থ।

তাই অটিজম এর বিরুদ্ধে সতর্কতা নয়, বরং সমাজকে সংশোধন করার জন্য অভিযান করুন, যাতে অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন সহজসাধ্য হতে পারে, যাতে সমাজ অটিস্টিক ব্যক্তির কথা সম্মানের বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারে।

আরও পড়ুনঃ

Chown, Nick. "Who benefits from autism research? And to what extent is it participatory and/or emancipatory?: A brief follow-up to Pellicano, Dinsmore and Charman (2014)." Autism Policy and Practice 2, no. 1 (2019): 93-95.

Armstrong T. The myth of the normal brain: embracing neurodiversity. AMA J Ethics. 2015 Apr 1;17(4):348-52. doi: 10.1001/journalofethics.2015.17.4.msoc1-1504. PMID: 25901703.

Czech, Herwig. "Hans Asperger, national socialism, and “race hygiene” in Nazi-era Vienna." Molecular autism 9, no. 1 (2018): 1-43.

Long-term ABA therapy is abusive: A response to Gorycki, Ruppel, and Zane; by A. H. Sandoval Norton, Gary Shkedy, Dalia Shkedy; Advances in Neurodevelopmental disorders (2015) 5:126-134

How much complience is too much complience: Is long term ABA abuse? by A. H. Sandoval-Norton and Gary Shkedy, Cogent Psychology (2019), 6:1, 1641258.

Ethical concerns with Applied Behaviour Analysis for Autism Spectrum “Disorder”. by Daniel A Wilkenfeld, Allison M. McCarthy; Kennedy Institute of Ethics Journal, Volume 30, Number 1, March 2020, pp. 31-69 (article).

Thibault, R. (2014). Can autistics redefine autism? The cultural politics of autistic activism. Trans-Scripts, 4, 57-88.

Waltz, M. M. "Getting from 'you can’t speak for my child' to ‘nothing about us without us' :: A brief history of diagnostic denial, misuse and misunderstanding in autism." Lancaster Centre for Disability Studies (CeDR) Conference, UK. 2018

হিন্দুত্ববাদের ধারণা বনাম ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদ

-মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

এম এস গোলওয়ালকর ও তার হিন্দু রাষ্ট্রের ভাবনা

এক দেশ- হিন্দুস্তান। তাতে আছে এক জাতি (রেস)- হিন্দু জাতি। সেই জাতি ধারণা সম্পূর্ণতা পায় হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ভাষার মাধ্যমে। এই হিন্দু ভাষা হল সংস্কৃত ও তার থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলি। এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা মিলে তৈরি হয়েছে এক নেশন- হিন্দুস্তান।

১৯৩৯ সালে নাগপুর থেকে প্রকাশিত ভারত পাবলিকেশন্সের 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইণ্ড' গ্রন্থে নেশন নিয়ে দীর্ঘ আলাপের শেষে এম এস গোলওয়ালকর আলোচনার নিস্পত্তি করেছেন হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণার মাধ্যমে। নেশনের এই ধারণার বাইরে যারা আছেন, অর্থাৎ যারা হিন্দু জাতি নন, বা হিন্দু ধর্মে আস্থা নেই, অথবা হিন্দু সংস্কৃতির থেকে দূরে অবস্থান করেন বা হিন্দুভাষী নন, সেই সব মানুষ হিন্দুস্তানে নিছক থাকতে পারেন তবে তাদের জাতীয় জীবনে কোন স্থান থাকতে পারে না। একমাত্র যদি তারা হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ভাষা ও হিন্দু জাতি-র অংশ হয়ে যেতে পারেন তবেই তাদের জাতীয় জীবনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া যায়। এই একশৈলিক নেশন হল এম এস গোলওয়ালকরের ভবিষ্যতের 'হিন্দুস্তানের' রূপরেখা।

এম এস গোলওয়ালকর ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসজ্ঘচালক অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রধান। তাঁর এই লেখা এখনও আরএসএসের মূল মতাদর্শ।

গ্রন্থটিতে তিনি রেস বা জাতি, তার সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রেস বলতে তিনি এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন যাদের অভিন্ন রীতিনীতি আছে, যারা এক ভাষায় কথা বলে, যাদের সংস্কৃতিও অভিন্ন। অতীত থেকে যেসব রীতি, আচারানুষ্ঠান, প্রথা, দর্শন ও ধর্ম অনুসরণ করা হচ্ছে তার একত্রিত প্রভাবে তৈরি হয় জাতির সংস্কৃতি। তিনি বলেছেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য। ধর্মের ওপরে ভিত্তি করেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতির আরেক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ভাষা। প্রতিটি জাতির নিজের দেশে নিজস্ব ভাষা উদ্ভূত ও বিকশিত হয়।

তিনি বিশ্বাস করেন, দেশ ও জাতির শিরদাঁড়া গড়ে ওঠে তার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং, জাতি ধারণায় তার উপাদানগুলোকে আলাদা করা যায় না। আসমুদ্রহিমাচল সকলের সাধারণ ভাষা হল সংস্কৃত। আর সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি প্রায় সকলে বুঝতে পারে এবং বিভিন্ন রাজ্যে এটিই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে হিন্দু জাতি হিন্দুস্তানে বসবাস করে। এদের উৎস, সংস্কৃতি এক। এক হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই দেশে বিশুদ্ধ, খাঁটি দেশজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা ছিল। শেষ এক হাজার বছর ধরে মুসলমান ও ব্রিটিশদের সাথে সংস্পর্শে এলেও এই সংস্কৃতি এখনও পৃথিবীর মহত্তম।

গোলওয়ালকরের হিন্দুস্তানে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম, ভাষা বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থান কোথায়? যে জনগোষ্ঠীগুলি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে হিন্দুস্তানে বসবাস করে না, যারা ভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন আচার নিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছে তারা ভারতের জনজীবনে কীভাবে অংশ গ্রহণ করবে?

যদি ভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন আচার নিয়ে কোন জনগোষ্ঠী হিন্দুস্তানে আসে, তাদের সামনে দুটি বিকল্প থাকবে।

এক, তারা হিন্দু নেশনের অংশীদার হবার জন্য নিজের ভাষা, জাতিসত্ত্বা, সংস্কৃতি ও ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের মূল প্রবাহে সংখ্যাগুরু মানুষের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের আলাদা কোন সত্ত্বা থাকবে না। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনে নয়; ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষায় মাতৃভূমির প্রধানতম জাতির (অর্থাৎ হিন্দু জাতি) মধ্যে তাদের লীন হতে হবে।
দুই, যদি সেই ভিনদেশি জনগোষ্ঠীগুলি নিজেদের ভিন্ন সত্ত্বা নিয়ে অবস্থান করে তবে তারা দেশে থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের অংশীদার হতে পারবে না।

এম এস গোলওয়ালকর তার কল্পনামাফিক হিন্দুস্তানের ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় প্রথমে আলোচনা করা দরকার কবে থেকে এই দেশে মানুষ বসবাস করছে। সেই মানুষ কারা? যেমন গোলওয়ালকার দাবি করেছেন, সত্যি কি এই দেশে ৮-১০ হাজার বছর আগে থেকে হিন্দুরা বসবাস করেছে? হিন্দু কারা?
কীভাবে ভারতে এতগুলি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এল? কেন আমি বা আপনি দক্ষিণ ভারতের ভাষা বুঝতে পারি না? আন্দামানের ওঙ্গেদের সাথে পঞ্জাবের মানুষের চেহারা তুলনীয় নয়, পরিধান বা খাদ্যেরও কোন সাদৃশ্য নেই, আর তাদের ভাষাও একেবারে ভিন্ন। অথবা একজন নাগা বা মিজোর সাথে দক্ষিণ ভারতীয় তামিলের কীবা সাদৃশ্য? কোন অভিন্নতা আছে এক বাঙালি উচ্চবর্ণের মানুষের সাথে সাঁওতাল পুরুষের? বাঙালি উচ্চবর্ণের খাদ্য কেন উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ খায় না? ভারতবর্ষে এত ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের মানুষ কেন আছে?
কোথায় আমাদের মিল? কোথায় আমাদের অমিল?

ভারতবর্ষে বিভিন্ন পরিযান ও জাতিগোষ্ঠী গঠন:

এম এস গোলওয়ালকর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব জার্মানির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একমাত্রিক স্বাধীন নেশনের কল্পনা করছেন, সেই একই সময়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ইতিহাস। প্রথমে তারা পুরাবস্তু, দেহাবশেষ ইত্যাদি খুঁজে বার করে, পরীক্ষা করে তার ইতিহাস লিখেছেন। আবার এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে জিনবিদ্যা বা জেনেটিক্সের সাহায্যে আরও সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারা যাচ্ছে কিছু চিরন্তন প্রশ্নের। কোথায় মানুষের সৃষ্টি? কবে ভারতে মানুষ এল?

ভারতবর্ষে প্রথম পরিযান ও তার পরম্পরা:

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বারবার পরিযান করেছে। জিনবিদ্যার সাহায্যে শরীরের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে আমাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বনারীর খোঁজ পাওয়া যায়। প্রমাণ করা যায়, মানুষের উদ্ভব আফ্রিকাতে। তারপর আজ থেকে ৭০-৭২ হাজার বছর আগে খাদ্যের অন্বেষণে একদল মানুষ শুষ্ক শীতল পূর্ব-আফ্রিকা ছেড়ে শুরু করে প্রব্রজন। সেই ছোট্ট গোষ্ঠীর সন্ততিরাই আজ আফ্রিকার বাইরের সমস্ত মানুষের পূর্বজ। অর্থাৎ আফ্রিকার বাইরে যত মানুষ আজ এশিয়া, ইউরোপ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে আছে, তাদের সকলের পূর্বজরা ছিল আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসা সেই গোষ্ঠীতে।

আফ্রিকা থেকে বহির্গত সেই জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করে অন্তত ৬৫ হাজার বছর আগে। ওরা ছিল শিকারী ও সংগ্রাহক। ওরাই আদি ভারতীয়। আজকের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ওঙ্গে, সেন্টিনেলিজ, জারোয়ারা ওই প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর নিকটতম প্রতিনিধি। এমনকি আজকের সমগ্র ভারতের ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ মাতৃক্রমের (maternal lineage) দিক দিয়ে সেই আফ্রিকা-আগত মায়ের সরাসরি বংশধর। অর্থাৎ ওই সময়ে যে নারীরা সোজাসুজি এদেশে এসেছিলেন আজকের ভারতের অধিকাংশ নরনারী মাতৃক্রমে সরাসরি তাদের উত্তরসূরি।

পিতৃক্রমের (paternal lineage) হিসেবটা ভিন্ন। সেই যে ৬৫ হাজার বছর বা তার আগে ভারতবর্ষে প্রথম মানুষ এসেছে তার পরেও এই দেশে আরও কিছু পরিযান হয়েছে। তারা পূর্বোক্ত জনগোষ্ঠীর সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী পরিযানগুলিতে

পৃথিবীর অন্য অঞ্চল থেকে যে জনগোষ্ঠীগুলি ভারতবর্ষে এসেছে তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল নারীদের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে তাদের জিনগত ছাপ ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে অধিক মাত্রায় রয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে ইরান থেকে দ্বিতীয় পরিযান ও হরপ্পীয় সভ্যতা:

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে হরিয়ানার রাখিগর্হিতে হরপ্পীয় মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও ওই সময়কালের আরও কিছু দেহাবশেষ পাওয়া গেছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।
এই দেহাবশেষগুলির ডিএনএ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, আফ্রিকা থেকে প্রথম পরিযানের অনেক পরে, মাত্র ১২ হাজার বছর আগে, পূর্ব ইরানের দিক থেকে ভারত অভিমুখে এক জনগোষ্ঠীর পরিযান শুরু হয়। এদের সাথে আদি আফ্রিকাজাত শিকারি-সংগ্রাহকদের মিশ্রণের ফলে এক জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে এদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে তারাই হরপ্পীয় সভ্যতা গড়ে তোলে।

সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পীয় সভ্যতা এক বিস্ময়। এই সভ্যতা উপমহাদেশের প্রথম নগরকেন্দ্রিক ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
আবহাওয়ার পরিবর্তন ও তজ্জনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে আজ থেকে ৩.৯ হাজার বছর আগে হরপ্পীয় সভ্যতা ভেঙে পড়ে। তখন সিন্ধু তীরের সেই মিশ্র জনগোষ্ঠী খাদ্যের আশায় সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। এরা দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে এসে আবার ওখানকার প্রাচীন আফ্রিকা-আগত শিকারী-সংগ্রাহকদের সাথে আরও একবার মিশ্রিত হয়। আর সেই মিশ্র মানুষ সমগ্র ভারতে জাতিগোষ্ঠী গঠনে পরবর্তিকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

আজও ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বৃহৎ ভাষাপরিবার হল দ্রাবিড় ভাষাপরিবার, এতে প্রায় ১৯.৬৪% ভারতীয় কথা বলে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা ছিল না, সেই সময়ের মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে ইন্দো-ইউরোপীয় জিনও পাওয়া যায়নি। ইন্দো-ইউরোপীয় জিন কাকে বলে? কবে এই জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এল? কী করে বুঝব ইন্দো-ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়নি, বরং বিপরীতে বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছে? এবার সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

হরপ্পীয় সভ্যতার লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তবে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য বেদ নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদরা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন। কারা বেদ লিখেছিল? তারা কবে ভারতবর্ষে এল?

ভারতবর্ষে ইন্দো-ইয়োরোপীয় আগমন:

বেদ রচয়িতা বৈদিক-সংস্কৃতভাষীদের উৎপত্তি ও তাদের সময়কাল জানতে একত্রিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, শব্দতাত্ত্বিক ও জিনবিদদের চর্চার প্রয়োজন। কারণ উত্তর ভারত, ইরান ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এক অভিন্নতা অনেকদিন ধরেই ভাষাতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় সংস্কৃত ভাষা ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা, যেমন গ্রিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অথচ তুলনামূলকভাবে উত্তরপ্রদেশের অনেক কাছে তামিলনাড়ু অবস্থিত।

এই পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে অতীতে এদের মধ্যে কোন এক সংযোগ ছিল। সমগ্র ইউরোপীয় ও প্রাচ্যের কিছু ভাষার উৎসের সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে এক আদি ভাষার খোঁজ চলে। শেষ পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে এই ভাষাগুলিকে নিয়ে এক ভাষাবৃক্ষ তৈরী করা হয়। তার চূড়ায় যে আদি ভাষা আছে তার নাম দেওয়া হয় 'প্রোটো-ইন্দো ইউরোপীয়'। সেই আদি ভাষা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলিকে প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা হিসেবে শনাক্ত করা যায়। আজকে অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে পন্টিক-স্তেপ অর্থাৎ কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান

সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক দল পশুপালক ওই 'প্রোটো-ইন্দো ইউরোপীয়' ভাষায় কথা বলত। এদের সাথেই ওই ভাষা ও তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উপভাষা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করে।

আজকে ভারতবর্ষে প্রায় ৭৮.০৫% ভারতীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্তর্গত বৈদিক সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলিতে কথা বলে।
বৈদিক সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলিতে যারা কথা বলে তাদের মধ্যে এক বিরাট অংশের পুরুষদের ক্ষেত্রে 'ওয়াই-ক্রোমোজোম ডিএনএ' (যা পুরুষরা পিতার কাছ থেকে বংশপরম্পরায় পায়) রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় পুরুষের ওই ডিএনএ-র এক বিশেষ উপশাখার অনুরূপ। প্রায় ৪.৭ হাজার বছর আগের সেন্ট্রাল এশিয়াতে সেই বিশেষ উপশাখার প্রাচীনতম রূপটি এক প্রাচীন মানুষের দেহাবশেষে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ আমাদের উত্তর ভারতের কিছু মানুষের মধ্যে যে ডিএনএ-উপশাখা আছে তার সবচাইতে প্রাচীন রূপটি পাওয়া যায় সেন্ট্রাল এশিয়াতে। ভারতবর্ষে নয়।

দ্বিতীয়ত, মধ্য এশিয়ার সেই প্রাচীন দেহাবশেষে কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার আফ্রিকাজাত শিকারী-সংগ্রাহক বা ইরান থেকে আগত জনগোষ্ঠীর ডিএনএ পাওয়া যায়নি। তাই দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ওই অঞ্চল পরিযানের ফলে সেন্ট্রাল এশিয়াতে এই ডিএনএ-উপশাখার বিস্তার সম্ভব নয়; বরং এ থেকে এর উল্টোটাই, অর্থাৎ স্তেপভূমির মানুষের এইদেশে প্রবেশ প্রমাণিত হয়।

স্তেপের পশুপালকরা ইউরোপেও গিয়েছিল। চার হাজার বছর আগে ইন্দো-ইউরোপীয় বৈদিক সংস্কৃতভাষী স্তেপ পশুপালকরা সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করে। হরপ্পীয় সভ্যতার মানুষ তখন দেশের দক্ষিণ দিকে চলেছে। যত দক্ষিণে যাচ্ছে তত মিশ্রিত হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিকারি-সংগ্রাহকদের সাথে। ইতিমধ্যে,যে হরপ্পীয় মানুষ উত্তর ভারতে থেকে গেছে স্তেপের পশুপালকদের সাথে তারা মিশে যাচ্ছে। এই মিশ্রণের প্রয়োজন হয়েছিল নারীর জন্য। ইন্দো-ইউরোপীয়দের মধ্যে নারী ছিল কম।

ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও ক্ষীয়মান তবুও এই দেশে তখনও যে সংস্কৃতি ছিল সেটা উপাদানগত বিচারে বৈদিক আর্যদের থেকে ছিল শ্রেষ্ঠতর। গুণগতভাবে এই শ্রেষ্ঠতর সংস্কৃতি পশুপালক বৈদিক আর্যদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। তার জন্যই বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে এক মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। আর প্রাচীন বৈদিক আচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে দেশজ প্রাগার্য ধর্মীয় চিন্তা।তবে এই মিশ্রণ সম্পূর্ণ সমসত্ত্ব ছিল না। দেশের অঞ্চল, ভাষা ও বর্ণভেদে মানুষের মধ্যে মিশ্রণের আনুপাতিক পরিমাণ ছিল ভিন্ন।

সংস্কৃতভাষী জনগোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশের আগে অন্তত দুটি জনগোষ্ঠী পৃথিবীর ভিন্ন অঞ্চল থেকে এই দেশে এসেছে। তাদের বংশ পরম্পরা আজও চলেছে। এমনকি স্তেপভূমির সেই হালকা বর্ণের মানুষ এই দেশে এসে নারীর প্রয়োজনে ক্রমাগত মিশ্রিত হয়েছে আগে আসা জনগোষ্ঠীর সাথে। আবার পরে যখন নারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তখন ওরা বর্ণপ্রথা দৃঢ়ভাবে প্রচলন করেছে।

পূর্বভারতে কয়েকটি পরিযান:

এতো গেল উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে তিন মূল জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে প্রবেশও মিশ্রণের ইতিহাস।

এছাড়াও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কয়েকটি জনগোষ্ঠী পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছে।

পূর্ব ও মধ্য ভারতে দেখা যায় মুণ্ডা, হো, বিরহোর, সাঁওতাল, খাসি ইত্যাদিদের। এরা কারা?
এই জনগোষ্ঠীগুলি এক বিশেষ ভাষাপরিবারের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাকে বলে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাপরিবার।

মূলতঃ মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ১.১ কোটি অস্ট্রো-এশিয়াটিকভাষী মানুষ বাস করেন। আজকে অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের ডিএনএ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিতৃক্রমের বিচারে ওদের পুরুষরা বহন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ডিএনএ। সম্ভবত লাওস থেকে ৫ হাজার বছর আগে বিভিন্ন দলে ওরা ভারতে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ ওরা ইন্দো-ইউরোপীয়দের ভারতে প্রব্রজনের আগেই এই দেশে এসেছে।

এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে কিছু আদিবাসীগোষ্ঠী আছে যারা বিভিন্ন তিব্বতী-বর্মী ভাষাতে কথা বলেন। ত্রিপুরার ত্রিপুরী, জামাতিয়া, উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মণিপুরি বা মেইতেই, মিজো, বাংলাদেশের চাকমা, মারমা এই শ্রেণীভুক্ত। প্রায় ০.৭% ভারতীয় তিব্বতী-বর্মী ভাষাপরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে খুব সম্প্রতি ,২.৫-১ হাজার বছর আগে,'প্রাচীন তিব্বতী-বর্মী' জনগোষ্ঠীএই দেশে আসে। ওরা মূলতঃ দুই বাংলার পূর্ব সীমান্ত ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস করে।

এক জাতি, এক ভাষা,এক ধর্ম, এক সংস্কৃতিঃ

হিন্দু জাতি- ভারতবর্ষে কোন একটি রেস্ বা জাতি নেই। একটি জনগোষ্ঠী এই দেশ তৈরি করেনি। অন্তত ৫টি পৃথক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে। এদের উৎস এক নয়। তবে প্রথম তিনটি জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মিশ্রিত হয়েছে। আর তাই ভিলদের মধ্যেও পাওয়া যায় উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণের ইন্দো-ইউরোপীয় ডিএনএ। অবশ্য দেশের অঞ্চল, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে মিশ্রণের তারতম্য আছে। এদের সার্বজনীন কোন রীতি নেই। এরা এক ভাষায় কথা বলেন না।
মুণ্ডারি ও দ্রাবিড়দের আত্মগৌরব তুলনীয় নয়।

আজকে প্রমাণিত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে যদি কোন তিনটি জিন সর্বব্যাপী হয় সে তিনটি হল আন্দামানের ওঙ্গে জনজাতির জিন (মাতৃক্রমে) এবং হরপ্পীয় ও স্তেপভূমির অর্ধ-যাযাবর পশুপালকদের জিন (পিতৃক্রমে)।

হিন্দু ভাষা- সংস্কৃত ও তার থেকে উদ্ভূত ভাষাপরিবারের বাইরে এই দেশের ২২% মানুষ কথা বলেন। তামিল ভারতের প্রথম আইন স্বীকৃত শাস্ত্রীয় ভাষা। কোন অজুহাতেই হিন্দির জন্য তামিলরা তাদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেবে না। এই প্রসঙ্গে বলি, ভারতবর্ষে আছে ২২টি মূল ভাষা। তবে ছোট বড় মিলিয়ে ১৯,৫০০টি ভাষায় মানুষ কথা বলে। এই বিভিন্নতা তৈরি হয়েছে শেষ ৫ হাজার বছর ধরে।

হিন্দু ধর্ম-হরপ্পীয় মানুষ সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতিপূজারী ছিল। সম্ভবত ওরা শিশ্নপূজা অর্থাৎ লিঙ্গপূজা করত। মৃত্যুর পরে দেহ মাটি চাপা দিত। ওখানে ধর্মীয় উৎসর্গীকরণ যেমন মহিষ-বলি, শোভাযাত্রা, স্বস্তিকা চিহ্নের ছবি পাওয়া গেছে।
ভারতে আগত ইন্দো-ইউরোপীয়রা মূর্তিপূজক ছিল না। ওরা ঘৃণা করত শিশ্নপূজাকে। অগ্নিসংস্কার ও যজ্ঞে রাখত আস্থা, আস্থা ছিল বেদের মহত্বে। মনে করত মানুষ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর।

তারপর বহু শতাব্দী ধরে হরপ্পীয় ও বৈদিক সংস্কৃতভাষী মানুষের মিশ্রণ হয়েছে। আর ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম আজকের রূপ নিয়েছে। এবার ভাবুন হিন্দুদের প্রধান জীবনচর্যা ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান প্রণালীর কথা। হিন্দু ধর্মের বৈবাহিক ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার মূলে আছে অগ্নিসংস্কার, যজ্ঞ। এছাড়াও বিবাহে আছে আরও অনেক স্ত্রী-আচার যেগুলি মূলতঃ হাজার হাজার বছরের দেশজ প্রথা। মৃতদেহ সৎকার হয় বৈদিক প্রথায়। মূর্তিপূজা, শিশ্নপূজা, ধর্মে বৃক্ষ ও পশুর গুরুত্ব এসেছে হরপ্পীয় সভ্যতা থেকে। তার সঙ্গে স্থানীয় নানা ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর নানা আচার হিন্দুধর্মের নানান স্থানীয় রূপভেদের মধ্যে এসে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আচারসমগ্র এক ধর্মের রূপ নেয়। তবু আজও খাদ্যাভ্যাস, বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরির নিয়মবিধি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন।

ভারত সরকারের ‘এনথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’-র ‘পিপল অফ ইন্ডিয়া’ প্রজেক্ট দেশের ৪৬৩৫ জনগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণা করে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, গোত্র, বংশনাম নিয়ে এক তালিকা প্রস্তুত করে। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে এই সমস্ত তথ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। নিরীক্ষণ করা জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বর্তমানে হিন্দু ধর্মে ৩৫৩৯টি আলাদা সম্প্রদায় আছে, মুসলিমদের মধ্যে আছে ৫৮৪টি সম্প্রদায়, খৃস্টানদের মধ্যে ৩৩৯টি, শিখদের মধ্যে ১৩০টি, জৈনদের মধ্যে ১০০টি আর বৌদ্ধদের মধ্যে ৯৩টি সম্প্রদায়। এছাড়াও আছে পার্সি, ইহুদি এবং আরও ৪১১টি ট্রাইবাল সম্প্রদায়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মতো আছেই, সেই ধর্মগুলির মধ্যেও আছে আলাদা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়গুলি তাদের বিভিন্নতা ধরে রাখতে আগ্রহী।

হিন্দু সংস্কৃতি- সংস্কৃতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকে। তবে তার বাইরেও সংস্কৃতির একটা বিরাট পরিসর আছে। খাদ্য, বস্ত্র, আচার এবং অনুষ্ঠান, উৎসব, ঐতিহ্য ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে তৈরি হয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

সময়ের সাথে সাথে ভারতবর্ষে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। আবার একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভ্যাস হয়েছে ভিন্ন। বিগত ১০০ বছর ধরে হরপ্পীয় সভ্যতার বিভিন্ন সাইটগুলিতে পাওয়া গেছে প্রভূত পরিমাণে গবাদি পশু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, পাখি, শূকর ইত্যাদির কঙ্কাল। প্রাচীনকালের মাটির বাসনে অনেক সময়ে লেগে থাকে পশু চর্বিজাত লিপিড। ওরা লিপিড বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, সেই সময়ে হরপ্পীয় জনগোষ্ঠী শূকর, ভেড়া এবং গরু, মহিষের মাংস প্রভূত পরিমাণে খেত।
আবার পরবর্তীকালে স্তেপভূমির আর্যভাষীদের মূল খাদ্য ছিল ফল, দুধ, ক্ষীর এবং আগুনে ঝলসানো গো ও অন্যান্য মাংস। পরবতীকালে এরা প্রাগার্যদের থেকে কৃষিকাজ শেখে। তবে উপনিষদের যুগে খাদ্যাভাব রুখতে গরু ও ষাঁড়ের মাংস খাওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা আসে।

মনুর সময়ে বর্ণবিভক্ত সমাজে বর্ণবিশেষে খাদ্যও হয়ে যায় ভিন্ন। মনুর বিধান ছিল ব্রাহ্মণের খাদ্য হবে সাত্ত্বিক। সে খাবে ফল, দুধ, মধু, অন্ন। ক্ষত্রিয়র খাদ্য ছিল রাজসিক- শিকার করা মাংস। ময়ূর বা হরিণের মাংস রাজসিক গুণসম্পন্ন বলে ধরা হত। অধিকাংশ শূদ্র মাংস খেত। তবে দরিদ্র মানুষ কোনকালেই খাদ্যবিচার করে না। সেই বৈদিক যুগেও চণ্ডালরা অনেক সময়ে খেয়েছে কুকুরের মাংস, কারণ একমাত্র এই মাংসই বিনা পয়সায় পাওয়া যেত।
এই খাদ্যবিভাজন দেশের বিভিন্ন অংশে সমান ভাবে বাস্তবায়িত হত না। খাদ্যবিধির মূল কারণ হল আর্থ-সামাজিক। বাংলা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। তাই বাঙালির খাদ্যবিধান উত্তরপ্রদেশের মনুর বিধান অনুযায়ী পুরোপুরি চলেনি।

শুধু তো খাদ্য নয়। বাঙালি হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান হয় রাতে, দক্ষিণ ভারতে দিনে। উত্তর ভারতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে মামা-ভাগ্নি বা মামাতো, পিসতুতো ভাই-বোনে বিবাহ কাম্য।

বাৎসরিক মূল ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন। বাঙালির দুর্গাপূজা, মারাঠির গণেশ চতুর্থী, উত্তর ভারতের বৈষ্ণবদের গোবর্ধনপূজা। ঐতিহাসিককালে ভারতবর্ষ একই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একত্রিতভাবে দীর্ঘদিন থাকেনি। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক রীতিনীতি, প্রথা, খাদ্যাভ্যাস।
এই বিভিন্নতা আমাদের সংস্কৃতি। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

পরিশিষ্ট:

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে বহু পরিযান হয়েছে। তাই প্রাগিতিহাস বা ইতিহাসের দীর্ঘ সময়কাল ধরে ভারতবর্ষ বিপুল সংখ্যক মানুষকে ধারণ করেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যখন মিশ্রিত হয়েছে, তখন অন্যের থেকে কিছু শিখেছে, কিছু নিজেরা উদ্ভাবন করেছে। আবার মানুষের আঞ্চলিক মিউটেশন সাহায্য করেছে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজিত হতে, বেঁচে থাকতে, উন্নততর প্রজন্মের জন্ম দিতে।

গোলওয়ালকর ইতিহাসকে স্বনির্মাণ করেছেন। আজ থেকে ৯০ বছর আগেও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে তাঁর তত্ত্বের ত্রুটি দেখানো সম্ভব ছিল। কিন্তু এদেশের প্রকৃত প্রাগিতিহাস তখনও অনেকটা অজানা ছিল। আজ সেটা বিশদভাবে, নিশ্চিতরূপে জানা গিয়েছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের কোথাও বিশুদ্ধ জাতি বা 'রেস' নেই। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের দেহেও আছে আফ্রিকান শিকারী-সংগ্রাহক আর প্রাচীন ইরানীয় শিকারী-সংগ্রাহকের জিন। আছে ইন্দো-ইউরোপীয় রক্ত। একমাত্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গে বা অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীরা হল খাঁটি অবিমিশ্র জনগোষ্ঠী। আদি অধিবাসীরা এখনও শিকারী ও সংগ্রাহকের জীবন যাপন করে।

সভ্যতার বীজ রয়েছে জনগোষ্ঠীর মেলামেশায়, জ্ঞানের আদান প্রদানে। ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে বহু পরিযান হয়েছে। তারা এই দেশকে নিজভূমি করে নিয়েছে। আমার আপনার পূর্বজ পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আসুক আজ আমরা সবাই ভারতবাসী।

প্রধান কয়েকটি তথ্যসূত্র:

১) M. S. Golwalkar, "We or Our Nationhood Defined", Bharat Publications, Nagpur, 1939

২) Stephen Oppenheimer, "Out-of-Africa, the peopling of continents and islands: tracing uniparental gene trees across the map," Phil. Trans. R. Soc, B367770–784, (2012)

৩) V. M. Narasimhan et al., "The formation of human populations in South and Central Asia," Science, 365(6457), (2019)

৪) Priya Moorjani et al., "Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India," Am Journal of Human Genetics, 93(3), (2013)

৫) Iain Mathieson et al., "Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians," Nature, 528, (2015): 499–503

বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা - মিথ-মিথ্যার মিশেল

-দেবোত্তম চক্রবর্তী

অলস, কল্পনাপ্রবণ বাঙালি যা জানে তা হল শিকাগোয় ১৮৯৩এ এক ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে বিবেকানন্দ 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স' বলে ভাষণ শুরু করে পেয়েছিলেন জগৎজোড়া খ্যাতি। অথচ এর চাইতে হাস্যকর দাবি আর কিছুই হতে পারে না। বাঙালি সেই সম্মেলনে অন্য ভারতীয় বা বাঙালি প্রতিনিধিদের নাম জানে না, বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা পড়ে দেখার পরিশ্রম করে না এবং সমস্ত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার সময় নষ্টও করে না।

শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন বলে যেটি প্রচার করা হয় আদতে সেটি ছিল কলম্বাসের মৃত্যুর চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশ্বমেলা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় কুড়িটি সভা বা সম্মেলনের। অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু 'বিবেকানন্দ: প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন ধর্ম মহাসম্মেলন যে হচ্ছে এই সংবাদই অনেকে জানত না, এমনকি কলম্বিয়ান প্রদর্শনী দেখতে গিয়েও ধর্ম মহাসম্মেলনের কথা কেউ জানতে পারেনি। আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ ধর্ম মহাসম্মেলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না বা শোনেনি।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন "সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি"। অর্থাৎ বহু ধর্মাবলম্বীদের দেশ ভারতের প্রতিনিধি হয়ে নয়, হিন্দুধর্মের একজন হিসেবেই নিজেকে প্রচার করেছিলেন তিনি।

ওইদিন একই বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন, "যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি"। কিন্তু এই সম্মেলনেই আমরা দেখতে পাই তিনি অবলীলাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বেদসমূহকে 'অনাদি ও অনন্ত' বলেছেন, এমনকি পূর্বজন্মের ওপরও আস্থা প্রদর্শন করেছেন। এই কি 'সর্বধর্মসমন্বয়'-এর রূপ?

প্রকৃতপক্ষে শিকাগো ধর্মসভার প্রথম বক্তৃতাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ ঝড় তুলে দিয়েছিলেন বলে যে ধারণা আমাদের মধ্যে সুপ্রচলিত, তার অন্যতম ভিত্তি হল বিবেকানন্দ স্বয়ং এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রকাশিত বিবেকানন্দের জীবনী গ্রন্থগুলি।
১৮৯৩ সালের ২ নভেম্বর আলাসিঙ্গা পেরুমলকে বিবেকানন্দ লেখেন, "মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল, আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল,তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পত্রাবলী, ৭৪ সংখ্যক পত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৯)। সেই গ্রন্থগুলিতে আমরা এও পড়ি যে, 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স' বলে তিনি বক্তৃতা শুরু করলে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ও করতালিতে বিপুল অভিনন্দন জানায় বলে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।
কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে শিকাগোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ Chicago Daily Tribune, Chicago Herald বা Chicago Inter Ocean-এ এমন কোনও কথা ছাপাই হয়নি। এমনকি আমেরিকার চারটি বিখ্যাত সংবাদপত্র New York Times, New York Herald, New York Daily Tribune ও Boston Evening Transcript-এ ১২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে অনেক খবর থাকলেও বিবেকানন্দের নামও উল্লেখ করা হয়নি, বক্তৃতার লিপি তো দূরের কথা।

১৮৯৬ সালের ১৯ জানুয়ারি 'দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এ 'The doctrine of the Swami' শীর্ষক বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একমাত্র সংবাদেও এমন কিছু বলা হয়নি। শুধু আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ভ্রান্ত তথ্য দিয়েই বিবেকানন্দ ক্ষান্ত হননি, সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর 'কাল্পনিক' ভূয়সী প্রশংসার সেই খবর ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ চিঠির আকারে ছাপেন এবং তারপর থেকেই শুরু হয় মিথ ও মিথ্যার এই সুপরিকল্পিত নির্মাণ।
লরেন যে লরেনকে চিনবে এতে আর প্রশ্ন কেন!

কবিতা:

চোরের মায়ের বড় গলা

-সুকমল সরকার।

পচামাল আছে আমার দোকানে,
তবুও খদ্দেরে যদি নেয় কিনে,
তবে আমার দোষ কোনখানে?
আমার দোকানে যদি গু বিক্রি করি,
খদ্দেরে কিনে যদি করে কাড়াকাড়ি!
আমার দাপট তো চলবেই বাড়াবাড়ি।
যে গুরু রা, সবাইকে দেয় দীক্ষা,
তাদের নিজেদেরই নাই সুশিক্ষা,
কেউকেউ তো দেখি করে ভিক্ষা,
তবুও সবাই তাকে খুব সযতনে,
ঘটা করে বাড়িতে ডেকে এনে,
দীক্ষা নিয়ে লুটিয়ে পড়ে চরণে,
পা চেটেপুটে খায় ধার্মিক গনে,
পিতার চেয়েও তাকে বড় মানে,
গৌরবে বলে আমি দীক্ষিত এখনে,
আমার বেশি দুঃখ সেইখানে।
এরচেয়েও বেশি যাবেনা বলা,
কারণ চোরের মায়ের বড় গলা।

লেখক

-জামাল আনসারী

এই তো কিছু দিন আগের ঘটনা—
চোখ রাঙিয়ে পাঁচ পয়সার রাজনৈতিক নেতাটিও
তর্জনী উঁচিয়ে বলে গেল—
"এই লেখক!রাজনীতি নিয়ে কিচ্ছুটি লিখবি না!লিখলে ভাল হবে না!"
—ঠিক আছে! তাই হবে।তাই হবে।

এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে,
দুদিন পর, ধর্মের বর্জ্য পদার্থস্বরূপ ধর্মগুরু নামধারী,
আপাদমস্তক ভন্ড,লোভী লোকটিও
সর্বাঙ্গে নামাবলি জড়িয়ে কর্কশ ভাবে বলেছিল—
"এই লেখক !ভালো করে শুন ! ধর্মের কথা!
ধর্ম নিয়ে,জাতপাতের ভেদাভেদ নিয়ে একটিও শব্দ লিখবি না! লিখলে কিন্তু ভালো হবে না।"
—আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা,লিখব না। ...লিখব না।

পাড়ার জেলখাটা মস্তান দলবল নিয়ে এসে,খিস্তি মেরে,
হুমকি দিয়ে এইমাত্র চলে গেল।
ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে জানিয়ে দিল—
"এই লেখক! কান খাড়া করে শুন! অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম চালাবি না।
ভুল করেও যদি কলমে হাত দিস,ঐ হাত কেটে জগন্নাথ বানিয়ে দেবো।"
ঠিক আছে বাবা। তাই হবে ।আর লিখব না।

সেদিন পাশের গ্রামের কোটিপতি দেশ বিদেশ খ্যাত বিচারপতিটিও কানে কানে বলে গেল...
"ভারতের বিচার ব্যবস্থার দিকে প্রশ্ন তুলবি না।আর ধর্মনিরপেক্ষতা,গণতন্ত্র নিয়ে কিছু বলবি না।
আর যদি প্রশ্ন করিস,তার ফল কিন্তু মারাত্মক হতে পারে।"
—আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রশ্ন করব না।

যার গোপ-দাড়ি এখনও গজায় নি,তবুও পাড়ায় সমাজ-বিপ্লবী বলে পরিচিত,সেই কমিউনিস্ট ছেলেটি বড় বড় চোখ পাকিয়ে
প্রকাশ্য রাস্তার মোড়ে জানিয়ে দিল—
"এই লেখক। কি সব লিখছিস? সমাজের অসাম্য নিয়ে কিচ্ছুটি লেখবি না।কথাটা মনে থাকে যেন!নইলে...
সমাজের সর্ব স্তরের কাছ থেকে হুমকি, ধমকি, চোখ রাঙানি
সহ্য করতে করতে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া লেখকটি মুখের উপর প্রশ্ন ছুড়ে মারে, কেন? কেন লিখব না??
কমিউনিস্ট ছেলেটি ভুরু কুঁচকে বলে, "সমাজ বিপ্লব করা লেখকের কাজ নয়। "
—ও আচ্ছা।ঠিক আছে। লিখব না।

কেন লিখব? কাদের জন্য লিখব?
রাস্তার ফুটপাতের উপরে বসে থাকা ভদ্রলোকটির থেকে উত্তর এলো—"কলম থামাবে না।লিখে যাও। আমাদের জন্য লিখো।"
সাইকেল চালিয়ে যে শ্রমিকটি রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই শ্রমিকটি জানিয়ে দিয়ে গেল— "আমাদের জন্য লিখো।"

রাস্তার পাশ থেকে সাফাইওয়ালা দাদু বলে ওঠে—
"লিখে যাও লেখক।আমরা তো আছি।আমাদের জন্য লিখো।"
স্কুলব্যাগ পিঠে নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা হেঁটে হেঁটে স্কুল যেতে যেতে বলে গেল, —কাকু ভয় পেয়ো না।আমরা আছি।আমাদের জন্য লিখো।''

সঠিক

-প্রদীপ চক্রবর্তী

কুষ্ঠী দিয়ে মানুষ বিচার
পাথর দিয়ে ভাগ্য,
কালো চামড়া,সাদা চামড়া
কে বেশী যোগ্য?

ধর্ম গ্রন্থে আছে সব-ই
শুধু খুঁজে নাও,
রোগ হলে ধর্ম কোথায়?
হাসপাতালে যাও।

বন্যা-ভূকম্পে সম্পত্তি ক্ষয়
যতই ডাকো ভগবান,
প্রকৃতিকে ভালবাসো
সে যে মাতৃসমান।

মুক্ত মনের মানুষেরা
সদাই সুখী হয়,
কুসংস্কারকে বিদায় করার
এটাই সঠিক সময়।

ওর চোখ নাই নাক নাই

-মোহাম্মদ আল্লারাখা

যে দেশে রাজনৈতিক নেতা
অন্য জাতের মেয়েদেরকে
ধর্ষণ করতে উৎসাহ দেয়
কবর থেকে অন্য জাতের
মেয়েদের মৃতদেহ তুলে ধর্ষণ করতে বলে
যে দেশে ঈশ্বরের উপাসনালয়ে
অন্য জাতের নেহাত এক বালিকাকে
আটকে রেখে সাতদিন ধরে ধর্ষণ করা হয়
মৃতপ্রায় মেয়েটিকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে নরপশুর দল ধর্ষণ করতে করতে একটি মাংসের পিণ্ডে পরিণত করে মেরে ফেলে
যে দেশে ধর্ষকদের সমর্থনে জাতীয় পতাকা হাতে
মিটিং মিছিল হয়, বিক্ষোভ দেখানো হয়
যে দেশে দাঙ্গার সময় মেয়েদেরকে ধরে ধরে
ধর্ষণ করা হয় ঘরে বাইরে রাস্তা ঘাটে পার্কে
সে সব দৃশ্য আবার ভিডিও করে ছাড়া হয়
যারা দাঙ্গার ধর্ষণে অংশ নিতে পারেনি
তারা দাঙ্গার ধর্ষণের ভিডিও দেখে উপভোগ করে।
এসব নেতা মন্ত্রী জজ ব্যারিস্টার প্রশাসন বুদ্ধিজীবিদের সামনে ঘটে, সবাই দেখে, সবাই শোনে, সবাই নির্বিকার।
যে দেশে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে তার দু পা টেনে দেহ চিরে ফেলা হয়, যেখানে অপরাধীদের বিচারের দাবীর চেয়ে শাসক ও বিরোধীদের রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, কে কতো ফায়দা তুলতে পারবে ঘটনা থেকে।
যে দেশে রাজনৈতিক নেতা সভার মাঝে ঘোষনা করে অন্য রাজনীতির লোকদের ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার, তাদের মেয়েদেরকে ধর্ষণ করার
যে দেশে ধর্ষণে বাধা দিলে হাত পা হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া হয়, জিভ কেটে নেওয়া হয়, গলায় দড়ি ওড়না পেঁচিয়ে মেরে মৃতদেহকেই ধর্ষণ করা হয়
তারপর ধর্ষক ঘটনা স্থলেই দেহ জ্বালিয়ে দেয়
কখনো পুলিশ গিয়ে রাতের আঁধারে জ্বালিয়ে দেয়।
যে দেশে নিম্ন শ্রেনির নারীদেহ মানেই উচ্চ শ্রেণির
লোকদের মুফতে ভোগের অধিকার ভাবা হয়।
যে দেশে নারীকে মানুষ নয় কেবল সন্তান উৎপাদনের পালিত প্রাণী ও ভোগের বস্তু ভাবা হয়।
যে দেশে ধর্ষকদের নয়, ধর্ষিতা নারী ও তার পরিবারের লোকদের সাজা হয়।
যে দেশে ধর্ষকদের জাত দেখে রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী মিডিয়া পুলিশ এমনকি নেটিজেনরাও সরব নীরব হয়।
যে দেশে ধর্ষকদের সমর্থনে কলেজ ছাত্র ছাত্রীরাও
মিছিল করে, উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দেওয়ার সাহস পায়!

সে দেশে ধর্ষণ হবে না তো কোথায় হবে?
সে দেশে মানুষ নয়, সব মনুষ্যরূপী পশু বাস করে
তুই তোরা কি মনে করিস ধর্ষণকারীদের উৎসাহ দেবো অপছন্দের জাতের, অপছন্দের লোকদের মেয়েদের দেহের উপর ধর্ষণ চালাতে?

আর সব তোদের ঘরের মেয়েরা নিরাপদে থাকবে?
ওরে! লিঙ্গের চোখ নাই নাক নাই
ওটা চোখে দেখে না গন্ধ শুঁকে না
নারী দেহের মধ্যাংশের ওই ছেঁদা টুকু পেলেই এঁফোড় ওঁফোড় করে দেয়।
পৃথিবীর চরম পরম সেরা আনন্দময় আদরের বস্তুকে
আজ যারা ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা দিয়ে জাগাচ্ছিস
পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে
অন্যদের নারীদেহ ধর্ষণ করতে
সে কালই তোর, তারই নিজের মা বোন স্ত্রীকে
পশুর চোখ নিয়েই এঁফোড় ওঁফোড় করবে।
ওর চোখ নাই নাক নাই
ওটা চোখে দেখে না গন্ধ শুঁকে না